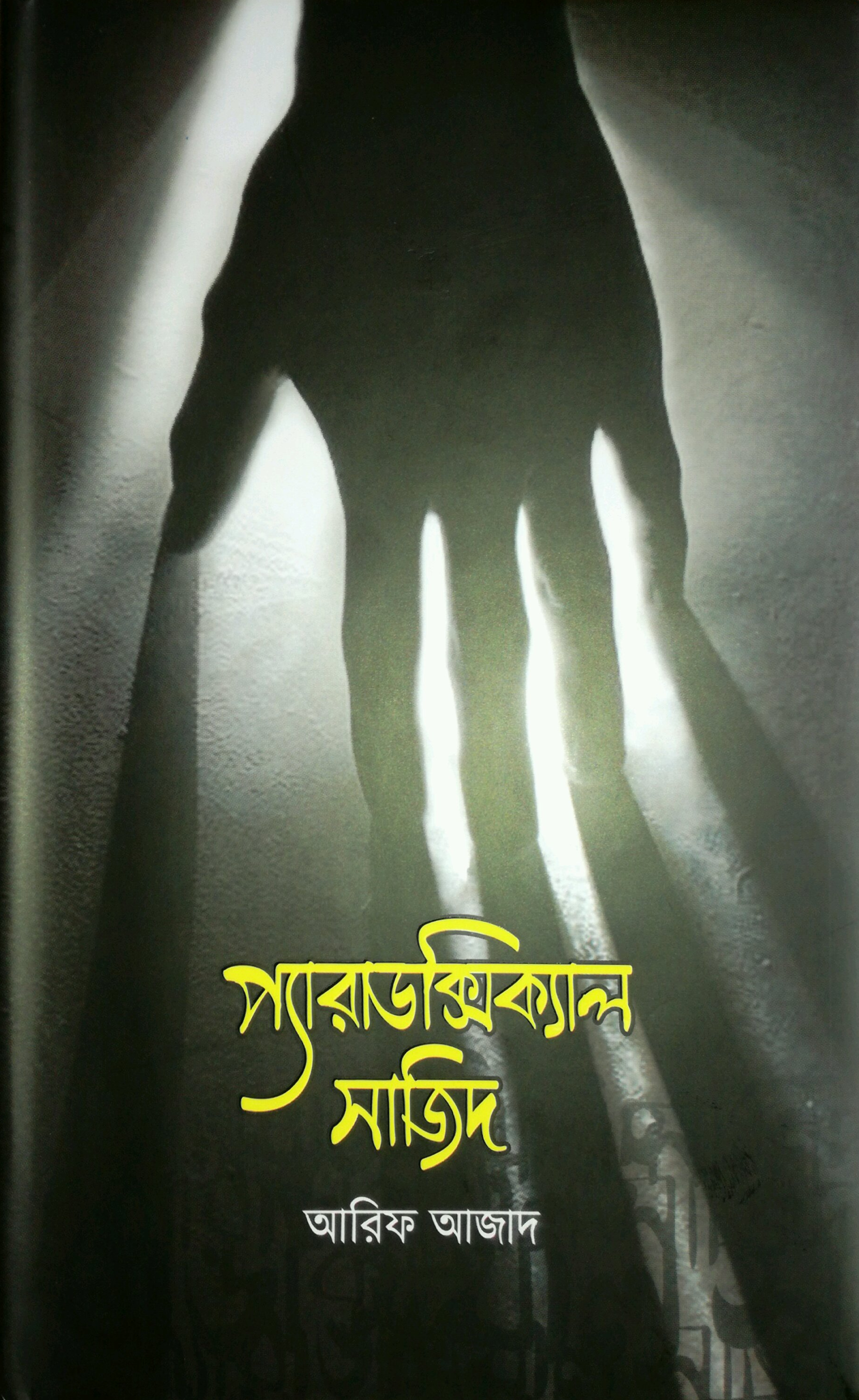
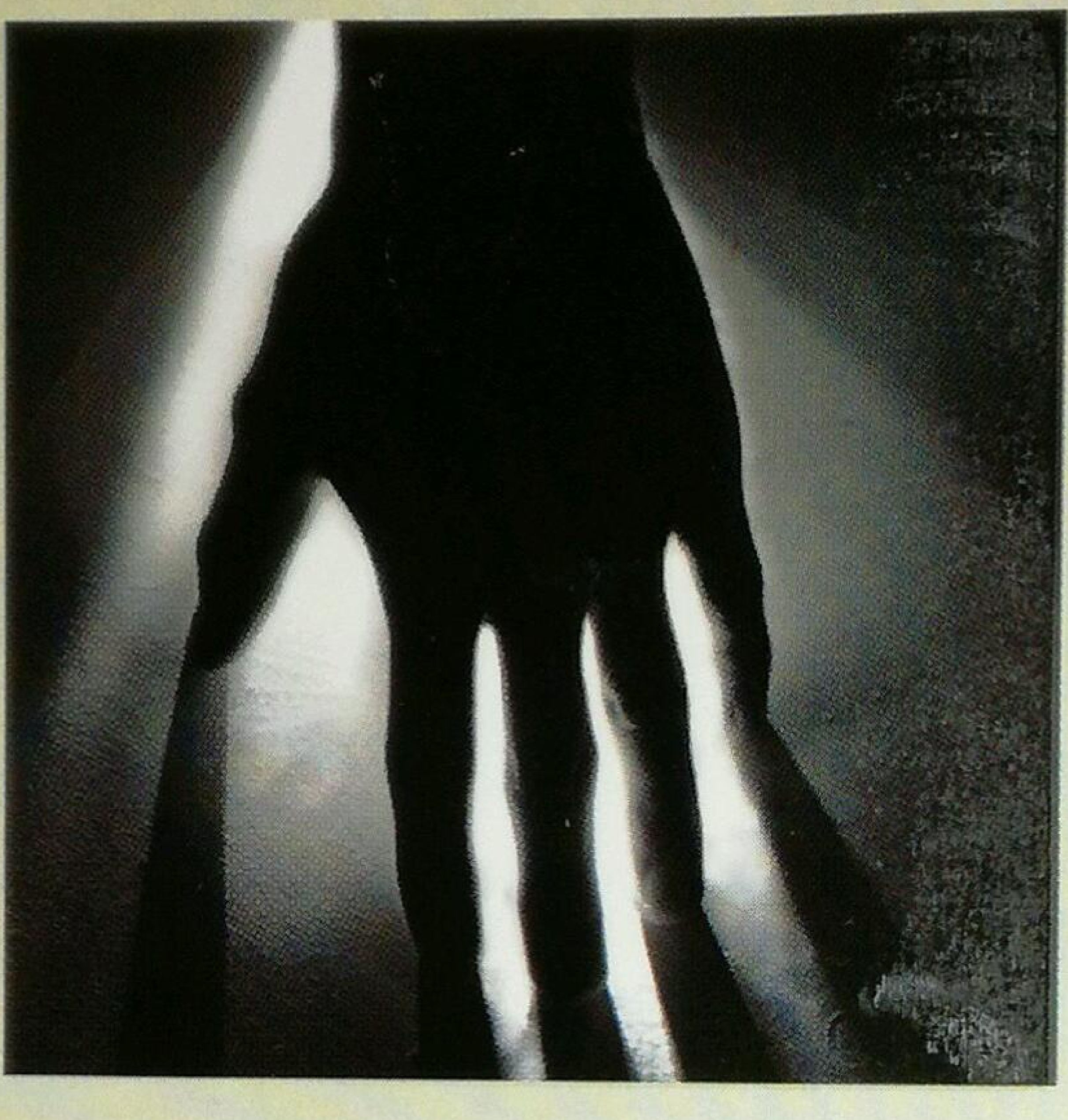


# প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ

আরিফ আজাদ



বিশ্বাসের কথা কতটা শক্ত করে বলা যায়? বিশ্বাসী প্রাণের সুর কতটা অনুপম হতে পারে? বিশ্বাসকে যুক্তির দাঁড়িপাল্লায় মাপা কি খুব সহজ? অবিশ্বাসীকে কতটা মায়াভরা স্পর্শে বিশ্বাসের শীতল পরশ দেয়া যায়? যুক্তিতেই মুক্তি নাকি বিশ্বাসের যুক্তিতে মুক্তি?

'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' পড়ে এসবের উত্তর মিলতে পারে।

গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ

# প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ

আরিফ আজাদ

গার্ডিয়ান

# প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ

আরিফ আজাদ

প্রকাশনায়
গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, (২য় তলা)
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

✆ ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮

guardianpubs@gmail.com

অনলাইন পরিবেশক :

www.rokomari.com

www.boibajar.com

প্রথম প্রকাশ : ৯ই ফেব্রুয়ারি- ২০১৭ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ : ২২ই ফেব্রুয়ারি- ২০১৭ ইং



প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

মূল্য : ৩০০.০০

ISBN-978-984-92959-0-7

Paradoxical Sajid by Arif Azad, Published by Guardian Publications, Price Tk. 300 Only.

# প্রকাশকের কথা

সভ্যতার শুরু থেকেই সত্য ও মিথ্যার ধারাবাহিক লড়াই। মানবতার সমাধান ইসলাম বরাবরই জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকদের অপপ্রচার ও বিদ্বেষ মোকাবেলা করে আসছে। আধুনিক সভ্যতার এই সময়ে দাঁড়িয়েও সেই ধারা অব্যাহত আছে। স্যোসাল মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান পরিসরকে ব্যবহার করে ইসলামদ্রোহী শক্তি সুকৌশলে তরুন প্রজন্মের চিন্তার রাজ্যে সন্দেহের বীজ বোপন করছে। সন্দেহ থেকে সংশয়, সংশয় থেকে অবিশ্বাস। এভাবে এক অবিশ্বাসী প্রজন্মের গোঁড়াপত্তন হচ্ছে কিবোর্ডে। কিছু অযাচিত বুলি শিখে, প্রশ্নের ডালি নিয়ে তারা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বাসীদের সুশৃংখল চিন্তার দুনিয়ায়। কিছু কিছু তরুন-যুবা দিকভ্রান্তও হচ্ছে। রক্তক্ষরণ হচ্ছে মুসলিম মিল্লাতে। অবিশ্বাসীদের আপাত চমকপ্রদ প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় হিমশিম অবস্থা। জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ যেখানে, সেখানেই বিশ্বাসী প্রাণের যৌক্তিক লড়াই। এমনই এক বিশ্বাসী তরুন আরিফ আজাদ। অনলাইন দুনিয়ায় অবিশ্বাসীদের উত্থিত প্রশ্নের সাবলীল উত্তর দিয়ে অজস্র মানুষের প্রিয়ভাজন হয়েছেন। একজন তরুন এত চমৎকার ও যৌক্তিক ভাষায় ইসলামবিরোধীদের জবাব দিতে পারেন, ভাবতেই আশাবাদী মন জানান দেয়– আগামীর দিন শুধু সম্ভাবনার। 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' বইটিতে গল্প ও সাহিত্যরস দিয়ে অবিশ্বাসীদের নানান প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে।

অনুভব করেছি আরিফ আজাদের কথাগুলো অনলাইন দুনিয়ার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের বাস্তব দুনিয়ায়ও থাকা উচিত। নাস্তিক্যবাদ ও ইসলামদ্রোহীদের অপপ্রচারের জবাবে অনেকেই লিখছেন, বলছেন। এই বইটি সেসব জবাবের ভিত্তিকে আরো মজবুত করবে। আমার বিশ্বাস বইটি তরুণ প্রজন্মের মনোজগতে এক তুমুল আলোড়ন তুলবে। আশা করি বইটি পড়ে অবিশ্বাসীরাও নির্মোহভাবে ইসলাম নিয়ে চিন্তা করবেন।

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স এই অসাধারন বইটি প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। স্যোসাল মিডিয়ায় লেখাগুলোকে পাণ্ডুলিপি আকারে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার কাজটা অনেক চ্যালেঞ্জের। বইটিকে যথাসম্ভব সুন্দর ও নিঁখুত করতে আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের কোন ত্রুটি ছিল না। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আমাদের যোগ্যতা ও

সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে বিশ্বাস করছি। লেখকের স্বকীয়তা এবং ভাষার বৈচিত্র বিবেচনায় প্রয়োজনে ইংরেজী শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নজর দেয়া স্বত্তেও কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। যেকোন সংশোধনীকে আমরা স্বাগত জানাবো। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে আরো সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করবো- ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটি আমাদের বিশ্বাসের প্রাচীরকে আরো মজবুত করুক। ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বাসের কথা প্রতি জনে, প্রতি প্রাণে।

৯ই ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইং — নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

# লেখকের কথা

সময় পাল্টেছে। পাল্টেছে যুগ আর মানুষের চাহিদা। সাথে সাথে মানুষের মধ্যে জানার আকাঙ্খাটাও বেড়েছে অনেক। পরিবেশ, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম- সবকিছু নিয়ে আমরা এখন সদা তৎপর। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছি সবাই। এই চলার পথে নানান মানুষের, নানান মতের সাথে পরিচিত হচ্ছি প্রতিনিয়ত। এই মত, পাল্টা মতের বিচার-বিশ্লেষণ, দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কারো বিশ্বাস পাল্টে যাচ্ছে, কারো বা সুদৃঢ় হচ্ছে আগের চেয়ে। এমনই সময়ের বাঁকে, ইন্টারনেট আর প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা নতুন অনেক কিছুই জানছি, যা হয়তো আগে জানতাম না। এই জানাটা আমাদের কাউকে আত্মবিশ্বাসী করছে, কাউকে করছে সংশয়বাদী। প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নানান প্রশ্ন। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়, কিলবিল করে এসব প্রশ্ন। 'এটা কি সত্যিই এরকম? এটা এমন কেনো? এটা আসলে কি হতে পারে?' এই জাতীয় নানান রকম প্রশ্নবাণে আমরা প্রায়ই জর্জরিত হই।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে আমিও নিজেও এসবের মুখোমুখি হই। এসবের উত্তর খুঁজতে নিজেকে ডুবিয়ে রাখি। জ্ঞানরাজ্যে পদার্পন করি জানার-শেখার আশায়।

একসময় ভাবলাম, এই প্রশ্নগুলো তো আমার একার নয়, আমার মতো অনেকের। আমি যতোটুকু জেনেছি আর বুঝেছি তা অন্যদের জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে একসময় কলম হাতে নেমে পড়ি। আমি সম্পূর্ণ জানি না। অনেক কিছুই আমার অজানা। তবে, যেটুকু আমি জেনেছি তা অন্যদের জানাতে আমি সামনে নিয়ে এলাম 'সাজিদ' কে। সাজিদ তার সাধ্যমতো প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করে। সাজিদ জানে তার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। তবুও সে তার সামর্থের সবটুকু দিয়ে বলে যায়। এভাবেই সাজিদ এগিয়ে যায়।

লেখাগুলো কখনো মলাটবদ্ধ হবে তা আমি ভাবিনি। এই লেখা মলাটবদ্ধ হবার পেছনে যার অনুপ্রেরণা, ভালোবাসা আর সহযোগিতা অপরিসীম, সেই শ্রদ্ধেয় নাসির ভাইকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। নবীন একজন লেখকের বই প্রকাশ করে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। লেখালেখির মূল অনুপ্রেরণা সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই প্রয়াশটুকু যাদের জন্য, বইটি যদি তাদের সামান্য উপকারেও আসে, তবেই আমার-আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আরিফ আজাদ
চট্টগ্রাম

# পাঠক প্রতিক্রিয়া

সাজিদ সিরিজ আমার খুবই প্রিয় একটা সিরিজ। কেন? কারণ যখন বাংলাদেশে চারদিকে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদের নাম করে আল কোরআন, ইসলাম ধর্ম ও মোহাম্মদ (সা) কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ করা হচ্ছে, ঠিক তখনই আরিফ আজাদের 'সাজিদ সিরিজ' তাদের মোক্ষম জবাব হিসাবে হাজির হলো। সাজিদের ভাষা সমসাময়িক, প্রাঞ্জল ও মনোমুগ্ধকর। তার উপস্থাপন লজিক্যাল, তথ্যপূর্ণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক।

→ আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ
কবি

লেখক আরিফ আজাদ এবং তার সৃষ্ট সাজিদ চরিত্রের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমার পরিচয়। শুরু থেকেই এ চরিত্রটি আমাকে মুগ্ধ করতে থাকে। সাজিদের মধ্য দিয়ে লেখক মানবিক ও মানসিক দ্বন্দ্ব দূর করে স্রষ্টার একক ও সর্বোচ্চ সত্তার সত্যায়ন, প্রচলিত মতভেদ ও ধ্যান-ধারণার সর্বাধুনিক নিষ্পত্তিকরণের কাজ করলেও এটিকে কেবল 'ধর্মীয়' তকমা দিয়ে উপসংহারে পৌঁছানো যাবে না। প্রতিটা বিষয়ের অবতারণা, উপস্থাপনা ও যুক্তিতর্ক এতটাই সাবলীল ও সুখপাঠ্য যে সাহিত্যের বিচারেও তার উৎকর্ষতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। সাজিদকে যদি কোনো গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রে বসিয়ে লেখক কাল্পনিক ঘটনার পরম্পরা সাজাতেন, তবুও তা সমাদৃত হতো বলেই আমার বিশ্বাস। এমনকি সাজিদের আশপাশের চরিত্রগুলোর আবেদনও কম নয়। তাদের দিয়ে মূল আবহটা তৈরি করার পর সাজিদকে সামনে এনেছেন। সাজিদ চরিত্রের আশ্রয়ে লেখক যেন নিজেকে প্রকাশ করেছেন বারবার। 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' সংকীর্ণতা, মুর্খতা ও অসত্যের ঢাকনা খোলার যুতসই চাবি।

→ সোহেল নওরোজ
বিশিষ্ট গল্পকার

কৈশোর থেকেই স্রষ্টা, জীবনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে আমার মনে নানা প্রশ্ন আসতো। প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে বিভিন্ন ধরনের বই ঘাটতাম এবং চিন্তা করতাম। পড়তে গিয়ে কোন প্রশ্নের উত্তর পেলে সব সময় মনে হতো এ বিষয়গুলোকে যদি প্রাণবন্ত করে গল্পের আকারে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে আমার মত যারা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করছেন, তাদের জন্য সহজ হতো। আরিফ আজাদ যেন আমার মনের সেই আকাঙ্খাকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আরিফের লেখনী অত্যন্ত ক্ষুরধার এবং উপস্থাপনশৈলী চমৎকার। আল্লাহ্ তার কলমকে অবিশ্বাসীদের অপপ্রচার অপণোদনে আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলুন।

→ আবদুল্লাহ সাঈদ খান
এম.বি.বি.এস, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

# সূচিপত্র

# একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস

আমি রুমে ঢুকেই দেখি সাজিদ কম্পিউটারের সামনে উঁবু হয়ে বসে আছে। খটাখট কী যেন টাইপ করছে। আমি জগ থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। খুব বেশি তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাবার জোগাড়। সাজিদ কম্পিউটার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল- 'কি রে কিছু হলো?'

আমি হতাশ গলায় বললাম- 'নাহ!'

–'তার মানে তোকে তাহলে এক বছর ড্রপ দিতেই হবে?' সাজিদ জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম–'কি আর করা। আল্লাহ্ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।'

সাজিদ আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল। এরপর বলল–'তোদের এই এক দোষ, বুঝলি? দেখছিস পুওর অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য এক বছর ড্রপ খাওয়াচ্ছে, তার মধ্যেও বলছিস, আল্লাহ্ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। ভাই, এখানে কোন্ ভালোটা তুই পাইলি, বলত?'

আগে সাজিদ সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার। আমি আর সাজিদ রুমমেট। সে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রো বায়োলজিতে পড়ে। প্রথম জীবনে সে খুবই ধার্মিক ছিল। নামাজ-কালাম পড়ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কীভাবে যেন অ্যাগনোস্টিক হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে স্রষ্টার উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে এখন পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে গেছে। ধর্মকে এখন সে স্রেফ আবর্জনা জ্ঞান করে। তার মতে পৃথিবীতে ধর্ম এনেছে মানুষ। আর 'ঈশ্বর' ধারণাটাই স্বার্থান্বেষী কোনো মহলের মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনামাত্র।

সাজিদের সাথে এই মুহূর্তে তর্কে জড়াবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তাকে একদম উপেক্ষা করেও যাওয়া যায় না। আমি বললাম– 'আমার সাথে তো এর চেয়েও খারাপ কিছু হতে পারতো, ঠিক না?'

–'আরে, খারাপ হওয়ার আর কিছু বাকি আছে না কি?'

– 'হয়তো।'

– 'যেমন?'

– 'এরকমও তো হতে পারত। ধর, আমি সারা বছর একদমই পড়াশোনা করলাম না। পরীক্ষায় ফেল মারলাম। এখন ফেল করলে আমার এক বছর ড্রপ হয়ে যেত। হয়তো ফেলের অপমানটা আমি মেনে নিতে পারতাম না। আত্মহত্যা করে বসতাম।'

সাজিদ হা হা হা করে হাসা শুরু করল। হাসি শেষ হতে না হতেই বলল- 'কী বিদঘুটে বিশ্বাস নিয়ে চলিস রে ভাই।'

এই বলে সে আবার হাসা শুরু করল। বিদ্রূপাত্মক হাসি। রাতে সাজিদের সাথে আমার আরও একদফা তর্ক হলো। সে বলল–'আচ্ছা, তোরা যে স্রষ্টায় বিশ্বাস করিস, তা কীসের ভিত্তিতে?'

আমি বললাম–'বিশ্বাস দু ধরনের। একটা হলো, প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বাস। অনেকটা ঠিক শর্তারোপে বিশ্বাস বলা যায়। অন্যটি হলো প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস।'

সাজিদ আবারও হাসল। সে বলল–'দ্বিতীয় ক্যাটাগরিকে সোজা বাংলায় অন্ধ বিশ্বাস বলে রে পাগল, বুঝলি?'

আমি তার কথায় কান দিলাম না। বলে যেতে লাগলাম–'প্রমাণের ভিত্তিতে যে বিশ্বাস, সেটা মূলত বিশ্বাসের মধ্যে পড়ে না। আর বিশ্বাসের মধ্যে পড়লেও তা খুবই টেম্পোরারি। এই বিশ্বাস এতই দুর্বল যে, এটা হঠাৎ হঠাৎ পাল্টায়।'

সাজিদ এবার নড়েচড়ে বসল। সে জিজ্ঞেস করল–'কী রকম?'

আমি বললাম–'এই যেমন ধর, সূর্য আর পৃথিবীকে নিয়ে মানুষের একটি আদিম কৌতূহল আছে। আমরা আদিকাল থেকেই এদের নিয়ে জানতে চেয়েছি, ঠিক না?'

–'হু, ঠিক।'

–'আমাদের কৌতূহল মেটাতে বিজ্ঞান অতীতেও আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে, ঠিক?'

–'হ্যাঁ।'

–'আমরা একাট্টা ছিলাম। আমরা নির্ভুলভাবে জানতে চাইতাম যে, সূর্য আর পৃথিবীর রহস্যটা আসলে কী। সেই সুবাদে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নানান সময়ে নানান তত্ত্ব আমাদের সামনে এনেছেন। পৃথিবী আর সূর্য নিয়ে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি। টলেমি কী বলেছিল সেটা নিশ্চয় তুই জানিস।'

সাজিদ বলল–'হ্যাঁ। সে বলেছিল সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।'

–'একদম তাই। কিন্তু বিজ্ঞান কি আজও টলেমির থিওরিতে বসে আছে? না, নেই। কিন্তু তুই কি জানিস এই টলেমির থিওরিটা বিজ্ঞান মহলে টিকে ছিল পুরো ২৫০ বছর। ভাবতে পারিস? ২৫০ বছর ধরে পৃথিবীর মানুষ, যাদের মধ্যে আবার বড় বড় বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ছিল, তারাও বিশ্বাস করত যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। এই ২৫০ বছরে তাদের মধ্যে যারা যারা মারা গেছে, তারা এই বিশ্বাস নিয়েই মারা গেছে যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।'

সাজিদ সিগারেট ধরাল। ভ্রু কুঁচকিয়ে তাকাল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল–'তাতে কী? তখন তো আর টেলিস্কোপ ছিল না, তাই ভুল মতবাদ দিয়েছে আর কি। পরে নিকোলাস কোপারনিকাস এসে তার থিওরিকে ভুল প্রমাণ করল না?'

–'হ্যাঁ। কোপারনিকাসও কিন্তু একটা মস্তবড় ভুল করে গেছে।'

সাজিদ প্রশ্ন করল–'কী রকম?'

–'অদ্ভুত! এটা তো তোর জানার কথা। কোপারনিকাস টলেমির থিওরির বিপরীত থিওরি দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে নয়, পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘোরে। কিন্তু তিনি এক জায়গায় ভুল করেন এবং সেই ভুলটাও বিজ্ঞান মহলে বীরদর্পে টিকে ছিল পুরো ৫০ বছর।'

–' ৫০ বছর? কোন্ ভুল?'

–'উনি বলেছিলেন, পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে, কিন্তু সূর্য ঘোরে না। সূর্য স্থির। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান বলে–নাহ, সূর্য স্থির নয়। বরং সূর্যও নিজের কক্ষপথে অবিরাম ঘুরছে।'

সাজিদ বলল–'সেটা ঠিক বলেছিস। কিন্তু বিজ্ঞান জগতে এটাই নিয়ম যে, বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হবে। এখানে শেষ বা ফাইনাল বলে কিছুই নেই।'

–'একদম তাই। আমিও জানি বিজ্ঞানে শেষ বা ফাইনাল বলে কিছু নেই। একটা বৈজ্ঞানিক থিওরি দুই সেকেন্ডও টিকে না, আবার আরেকটা দুই শ বছরও টিকে যায়। তাই প্রমাণ বা দলিল দিয়ে যা বিশ্বাস করা হয় তাকে আমরা বিশ্বাস বলি না। এটাকে আমরা বড়জোড় চুক্তি বলতে পারি। চুক্তিটা এরকম–তোমায় ততোক্ষণ বিশ্বাস করব, যতক্ষণ তোমার চেয়ে অথেনটিক কিছু আমাদের সামনে না আসছে।'

সাজিদ আবার নড়েচড়ে বসল। এবার সে কিছুটা একমত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম–'ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তার ধারণা বা অস্তিত্ব ঠিক এর বিপরীত। তুই দ্যাখ, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যকার এই গূঢ় পার্থক্য আছে বলেই আমাদের ধর্মগ্রন্থের শুরুতেই বিশ্বাসের কথা বলা আছে। কোরআনুল কারীমের সূরা বাকারার দুই নম্বর আয়াতে বলা আছে–এটা (কোরআন) তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে। যদি বিজ্ঞানে শেষ বা ফাইনাল কিছু থাকত, তাহলে হয়তো ধর্মগ্রন্থের শুরুতে বিশ্বাসের বদলে বিজ্ঞানের কথাই বলা হতো। হয়তো বলা হতো–'এটা তাদের জন্যই, যারা বিজ্ঞানমনস্ক।' কিন্তু যে বিজ্ঞান সদা পরিবর্তনশীল, যে বিজ্ঞানের নিজের উপর নিজেরই বিশ্বাস নেই, তাকে কীভাবে অন্যরা বিশ্বাস করবে?'

সাজিদ বলল–'কিন্তু যাকে দেখি না, যার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, তাকে কী করে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?'

আমি বললাম–'সৃষ্টিকর্তার পক্ষে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু সেটা বিজ্ঞান পুরোপুরি দিতে পারে না। এটা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, সৃষ্টিকর্তার নয়। বিজ্ঞান অনেক কিছুরই উত্তর দিতে পারে না। তালিকা করতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে। আমি তালিকা ধরে বলব? '

সাজিদ রাগি রাগি গলায় বলল–'ফাইজলামো করিস আমার সাথে?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম–'আচ্ছা শোন্ দোস্ত, বলছি। তোর প্রেমিকার নাম মিতু না?'

–'এইখানে আবার প্রেমিকার ব্যাপার আসছে কেন?'

–'আরে বল্ না দোস্ত আগে।'

–'হ্যাঁ।'

–'কিছু মনে করিস না। কথার কথা বলছি। ধর, আমি মিতুকে ধর্ষণ করলাম। রক্তাক্ত অবস্থায় মিতু তার বেডে পড়ে আছে। আরও ধর, তুই কোনোভাবে ব্যাপারটা জেনে গেছিস।'

–'হু।'

–'এখন বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা কর দেখি, মিতুকে ধর্ষণ করায় কেন আমার শাস্তি হওয়া দরকার?'

সাজিদ বলল–'ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চান। এটাকে বিজ্ঞান দিয়ে কীভাবে ব্যাখ্যা করব?'

–'হা হা হা। আগেই বলেছি। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যার উত্তর বিজ্ঞানে নেই।'

–'কিন্তু এর সাথে স্রষ্টায় বিশ্বাসের সম্পর্ক কী?'

–'সম্পর্ক আছে। স্রষ্টায় বিশ্বাসটাও এমন একটা বিষয়, যেটা আমরা, মানে মানুষেরা, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণাদি দিয়ে প্রমাণ করতে পারব না। স্রষ্টা কোনো টেলিস্কোপে ধরা পড়েন না। তাঁকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও খুঁজে বের করা যায় না। উনাকে স্রেফ বিশ্বাস করে নিতে হয়।'

সাজিদ এবার ১৮০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বেঁকে বসল। সে বলল–'ধুর! কী সব আবোল তাবোল বুঝালি। যাকে দেখি না, তাকে এভাবে বিশ্বাস করে নিব?'

আমি বললাম–'হ্যাঁ। পৃথিবীতে অবিশ্বাসী বলে আসলে কেউই নেই। সবাই বিশ্বাসী। সবাই এমন কিছু না কিছুতে ঠিক বিশ্বাস করে, যা তারা কখনো দেখেনি কিংবা আদৌ দেখার কোনো সুযোগও নেই। কিন্তু এটা নিয়ে তারা প্রশ্ন তোলে না। তারা নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে তাতে বিশ্বাস করে যায়। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি–তুইও ঠিক সে রকম।'

সাজিদ বলল–'আমি? পাগল হয়েছিস? আমি না দেখে কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করি না, ভবিষ্যতে কখনো করবও না।'

–'ওরে দোস্ত, তুই এখনো না দেখে অনেক কিছুই বিশ্বাস করিস এবং এটা নিয়ে তোর মধ্যে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন জাগেনি। আজকে এই আলোচনা না করলে হয়তো জাগতোও না।'

সে আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বললাম–' তুই কি জানতে চাস?'

–'হুম।' সাজিদ বলল।

–'আবার বলছি, কিছু মনে করিস না। যুক্তির খাতিরে বলছি।'

–'ঠিক আছে, বল।'

–'আচ্ছা, তোর বাবা-মা'র মিলনেই যে তুই জন্মেছিস, সেটা কি তুই কখনো দেখেছিলি? অথবা তোর কাছে এই মুহূর্তে এ সংক্রান্ত কোনো প্রমাণ আছে? হতে পারে তোর জন্মের আগে তোর মা তোর বাবা ছাড়া অন্য কারও সাথে দৈহিক সম্পর্ক করেছে। হতে পারে তুই সেই ব্যক্তিরই জৈব ক্রিয়ার ফল। তুই এটা দেখিস নি। কিন্তু প্রমাণহীন এই বিষয় নিয়ে কোনোদিন একবারের জন্যও কি তোর মা'কে প্রশ্ন করেছিলি? নিশ্চয় করিসনি। সেই ছোটবেলা থেকে যাকে বাবা হিসেবে দেখে আসছিস, এখনো তাকে বাবা বলে ডাকছিস। যাকে ভাই হিসেবে জেনে আসছিস, তাকে ভাই বলে ডাকিস। বোনকে বোন বলিস। তুই না দেখেই এসবে বিশ্বাস করিস না? কোনোদিন জানতে চেয়েছিস এখন যাকে বাবা

ডাকছিস, তুই আসলেই তার ঔরসজাত কি না? যাকে ভাই ভাবছিস, সে আসলেই তোর ভাই কিনা? প্রিয় বোনটি আদৌ তোর বোন কিনা? জানতে চাসনি। বিশ্বাস করে গেছিস। এখনো করছিস। ভবিষ্যতেও করবি। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসটাও ঠিক এমনই রে দোস্ত। এটাকে প্রশ্ন করা যায় না। সন্দেহ করা যায় না। এটাকে হৃদয়ের গভীরে ধারণ করতে হয়। এর নামই বিশ্বাস।'

সাজিদ উঠে বাইরে চলে গেলে। ভাবলাম, সে আমার কথায় কষ্ট পেয়েছে হয়তো। অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু বিষয়ে কথা বলে আমিও বিব্রত। নিজের উপর রাগ হচ্ছিল।

পরের দিন ভোরে আমি ফজরের নামাজের জন্য অযু করতে উঠেছি। দেখলাম, আমার পাশে সাজিদ এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। সে আমার চাহনির প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল–'নামাজ পড়তে উঠেছি।' ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি কিনা? চিমটি কেটে দেখলাম বাস্তবেই সাজিদ আমার সামনে। আমি তখন আকাশের দিকে তাকালাম। ভোরের আকাশটা তখন অনেক পরিষ্কার দেখাচ্ছিল।

# 'তাকদির বনাম স্বাধীন ইচ্ছা', স্রষ্টা কি এখানে বিতর্কিত?

সাজিদের ব্যাগে ইয়া মোটা একটি ডায়েরি থাকে সব সময়। ডায়েরিটা প্রাগৈতিহাসিক আমলের কোনো নিদর্শনের এত। জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। ছেঁড়া জায়গার কোনোটাতে সুতো দিয়ে সেলাই করা, কোনো জায়গায় আঁঠা দিয়ে প্রলেপ লাগানো, কোনো জায়গায় ট্যাপ লাগানো। এই ডায়েরিতে সে তার জীবনের নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো লিখে রাখে। বলে রাখি, সাজিদের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে আমার এক্সেস অনুমতিপ্রাপ্ত। এই ডায়েরির মাঝামাঝি কোনো এক জায়গায় সাজিদ আমার সাথে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটিও লিখে রেখেছে। তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয় টিএসসিতে।

সে আমার সম্পর্কে লিখেছে–

'ভ্যাবলা টাইপের এক ছেলের সাথে সাক্ষাৎ হলো আজ। দেখলেই মনে হবে জগতের কঠিন বিষয়ের কোনো কিছুই সে বুঝে না। কথা বলার পরে বুঝলাম, এই ছেলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিন্তু দেখতে হাবাগোবা। ছেলেটার নাম–আরিফ। ৫ই মার্চ, ২০০৯।'

এই ডায়েরিতে নানান বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথাও লেখা আছে। একবার কানাডার টরেন্টোতে সাজিদ তার বাবার সাথে একটি অফিসিয়াল ট্যুরে গিয়েছিল। সেখানে অনেক সেলেব্রিটির সাথে বিল গেটসও আমন্ত্রিত ছিলেন। বিল গেটস সেখানে দশ মিনিটের জন্য বক্তৃতা রেখেছিলেন। সেই ঘটনাটিও ডায়েরিতে লেখা আছে।

সিলেট শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি'র কম্পিউটার সাইন্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ড. জাফর ইকবালের সাথে সাজিদের একবার বই মেলায় দেখা হয়ে যায়। সেবারের বইমেলায় জাফর স্যারের বই 'একটুখানি বিজ্ঞান' এর দ্বিতীয় কিস্তি 'আরো একটুখানি বিজ্ঞান' প্রকাশিত হয়। বই কিনে বের হওয়ার পথে জাফর স্যারের সাথে দেখা হয়ে যায় সাজিদের। অটোগ্রাফ নিয়ে স্যারের কাছে হেসে জানতে চাইল 'স্যার, 'একটুখানি বিজ্ঞান' পাইলাম। এরপর পাইলাম 'আরো একটুখানি বিজ্ঞান'। এটার পরে, 'আরো আরো একটুখানি বিজ্ঞান' কবে পাচ্ছি?'

সেদিন নাকি জাফর স্যার মিষ্টি হেসে বলেছিলেন–'পাবে, পাবে।'

নিজের সাথে ঘটে যাওয়া এরকম অনেক ঘটনাই ঠাঁই পেয়েছে সাজিদের ডায়েরিটাতে। ডায়েরির আদ্যোপান্ত আমার পড়া ছিল। কিন্তু সেমিস্টার ফাইনাল সামনে চলে আসায় গত বেশ কিছুদিন তার ডায়েরিটা আর পড়া হয়নি।

সেদিন থার্ড সেমিস্টারের শেষ পরীক্ষাটি দিয়ে রুমে এলাম। এসে দেখি সাজিদ ঘরে নেই। তার টেবিলের উপরে তার ডায়েরিটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে।

ঘর্মাক্ত শরীর। কাঠফাটা রোদের মধ্যে ক্যাম্পাস থেকে হেঁটে বাসায় ফিরেছি। এই মুহূর্তে বসে ডায়েরিটা উল্টাব, সে শক্তি বা ইচ্ছে কোনোটাই নেই। কিন্তু ডায়েরিটা বন্ধ করতে গিয়ে একটি শিরোনামে আমার চোখ আটকে গেল। আমি সাজিদের টেবিলেই বসে পড়ি। লেখাটির শিরোনাম ছিল–'ভাগ্য বনাম স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি–স্রষ্টা কি এখানে বিতর্কিত?'

বেশ লোভনীয় শিরোনাম। শারীরিক ক্লান্তি ভুলেই আমি ঘটনাটির প্রথম থেকে পড়া শুরু করলাম। ঘটনাটি সাজিদের ডায়েরিতে যেভাবে লেখা, ঠিক সেভাবেই তুলে ধরছি–

'কয়েকদিন আগে ক্লাসের থার্ড পিরিয়ডে মফিজুর রহমান স্যার এসে আমাকে দাঁড় করালেন। বললেন–'তুমি কি ভাগ্য, আই মিন তাকদিরে বিশ্বাস করো?' আমি আচমকা অবাক হলাম। আসলে এই আলাপগুলো হলো ধর্মীয় আলাপ। মাইক্রোবায়োলজির একজন শিক্ষক যখন ক্লাসে এসে এসব জিজ্ঞেস করেন, তখন খানিকটা বিব্রতবোধ করাই স্বাভাবিক। স্যার আমার উত্তরের আশায় মুখের দিকে চেয়ে আছেন। আমি বললাম–'জ্বি, স্যার। অ্যাজ এ্যা মুসলিম, আমি তাকদিরে বিশ্বাস করি। এটি আমার ঈমানের মূল ছয়টি বিষয়ের মধ্যে একটি।'

স্যার বললেন–'তুমি কি বিশ্বাস করো যে, মানুষ জীবনে যা যা করবে তার সবকিছুই তার জন্মের অনেক বছর আগে তার তাকদিরে লিখে দেওয়া হয়েছে?'

–'জ্বি স্যার', আমি উত্তর দিলাম।

–'বলা হয়, স্রষ্টার ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি ক্ষুদ্র পাতাও নড়ে না, তাই না?'

–'বলুন স্যার।'

–'ধরো, আজ সকালে আমি একজন লোককে খুন করলাম। তাহলে কি আমার তাকদিরে পূর্ব-নির্ধারিত ছিল না?'

–'জ্বি, ছিল।'

–'আমার তাকদির যখন লেখা হচ্ছিল, তখন কি আমি জীবিত ছিলাম?'

–'না স্যার, জীবিত ছিলেন না।'

–'আমার তাকদির কে লিখেছে? কার নির্দেশে লেখা হয়েছে?'

–'স্রষ্টার।'

–'তাহলে, সোজা এবং সরল লজিক এটাই বলে, আজ সকালে যে খুনটি আমি করেছি, সেটি মূলত আমি করিনি। আমি এখানে একটি রোবট মাত্র।

আমার ভেতরে একটি প্রোগ্রাম সেট করে দিয়েছেন স্রষ্টা। সেই প্রোগ্রামে লেখা ছিল যে, আজ সকালে আমি একজন লোককে খুন করব। সুতরাং আমি ঠিক তাই-ই করেছি, যা আমার জন্য স্রষ্টা পূর্বে ঠিক করে রেখেছেন। এতে আমার কোনো হাত নেই। ডু ইউ অ্যাগ্রি, সাজিদ?'

–'কিছুটা স্যার', আমি উত্তর দিলাম।

মফিজুর স্যার এবার হাসলেন। হেসে বললেন–'আমি জানতাম তুমি কিছুটাই একমত হবে, পুরোটা নয়। এখন তুমি আমাকে নিশ্চয়ই যুক্তি দেখিয়ে বলবে স্যার, স্রষ্টা আমাদের একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। আমরা এটা দিয়ে ভালো–মন্দ বিচার করে চলি, রাইট?'

–'জ্বি স্যার।'

–'কিন্তু সাজিদ, এটা খুবই লেইম লজিক। ডু ইউ নো? ধরো, আমি তোমার হাতে বাজারের একটি তালিকা দিলাম। তালিকায় যা যা কিনতে হবে, তার সবকিছু লেখা আছে। এখন তুমি বাজার করে ফিরলে। তুমি ঠিক তাই তাই কিনলে যা আমি তালিকায় লিখে দিয়েছি এবং তুমি এটা করতে বাধ্য।'

এতটুকু বলে স্যার আমার কাছে জানতে চাইলেন–'বুঝতে পারছ?'

আমি বললাম–'জ্বি স্যার।'

–'ভেরি গুড! ধরো, তুমি বাজার করে আসার পর, একজন জিজ্ঞেস করল, সাজিদ কী কী বাজার করেছ? তখন আমি উত্তর দিলাম, ওর যা যা খেতে মন চেয়েছে, তা-ই কিনেছে। বলো তো, আমি সত্য বলেছি কিনা?'

আমি বললাম–'নাহ, আপনি মিথ্যা বলেছেন।'

স্যার চিৎকার করে বলে উঠলেন–'এক্সাক্টলি। ইউ হ্যাভ গট দ্য পয়েন্ট মাই ডিয়ার। আমি মিথ্যা বলেছি। আমি তালিকাতেই বলে দিয়েছি তোমাকে কী কী কিনতে হবে। তুমি ঠিক তা-ই কিনেছ, যা আমি কিনতে বলেছি। যা কিনেছ সব আমার পছন্দের জিনিস। এখন আমি যদি বলি- 'ওর যা যা খেতে মন চেয়েছে, সে তাই তাই কিনেছে', তাহলে এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা হবে, তাই না?'

–'জ্বি, স্যার।'

–'ঠিক স্রষ্টাও এভাবে মিথ্যা বলেছেন। দুই নাম্বারি করেছেন। তিনি অনেক আগে আমাদের তাকদির লিখে তা আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এখন আমরা সেটাই করি, যা স্রষ্টা সেখানে লিখে রেখেছেন। এ্যান্ড অ্যাট দ্যা এন্ড অফ দ্য ডে, এই কাজের জন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে, কেউ জাহান্নামে। কিন্তু কেন? এখানে মানুষের তো কোনো হাত নেই। ম্যানুয়ালটা স্রষ্টার তৈরি। আমরা তো জাস্ট

পারফর্মার। স্ক্রিপ্ট রাইটার তো স্রষ্টা। স্রষ্টা এর জন্য আমাদের কাউকে জান্নাত, কাউকে জাহান্নাম দিতে পারেন না। যুক্তি তাই বলে, ঠিক?'

আমি চুপ করে রইলাম। পুরো ক্লাসে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে তখন।

স্যার বললেন—'হ্যাভ ইউ অ্যানি প্রোপার লজিক অন দ্যাট টিপিক্যাল কোয়েশ্চান, ডিয়ার?'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

স্যার মুচকি হাসলেন। সম্ভবত ভাবছেন, উনি আমাকে এবার সত্যি সত্যিই কুপোকাত করে দিলেন। বিজয়ীর হাসি।

আমাকে যারা চিনে তারা সবাই জানে, আমি কখনো কারও প্রশ্নের উত্তর দিতে সময় নিই না। আজকে যেহেতু তার ব্যতিক্রম ঘটল, বন্ধুরা আমার দিকে ড্যাব ড্যাব চোখ করে তাকাল। তাদের চাহনি দেখে মনে হচ্ছিল, এই সাজিদকে তারা চেনেই না। কোনোদিন দেখেনি।

ক্লাসে আমার বিরুদ্ধমতের যারা আছে, তাদের চেহারা তখন মুহূর্তেই উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করল। তারা হয়তো মনে মনে ভাবতে লাগল— 'মোল্লাজির দৌঁড় ঐ মসজিদ পর্যন্তই।'

আমি মুখ তুলে স্যারের দিকে তাকালাম। মুচকি হাসিটা স্যারের মুখে তখনও বিরাজমান।

আমি বললাম—'স্যার, এই ক্লাসে কার সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?'

স্যার ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন। স্যার জিজ্ঞেস করেছেন কী আর আমি বলছি কী।

স্যার বললেন—'বুঝলাম না।'

—'মানে, আমাদের ক্লাসের কার মেধা কী রকম, সে বিষয়ে আপনার ধারণা কেমন?'

—'ভালো ধারণা। ছাত্রদের সম্পর্কে একজন শিক্ষকেরই তো সবচেয়ে ভালো জ্ঞান থাকে।'

আমি বললাম—'স্যার, আপনি বলুন তো, এই ক্লাসের কারা কারা ফার্স্ট ক্লাস পাবে আর কারা কারা সেকেন্ড ক্লাস পাবে?'

স্যার কিছুটা বিস্মিত হলেন। বললেন—'আমি তোমাকে অন্য বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। তুমি আউট অফ কনটেক্সটে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করছ, সাজিদ।'

—'না স্যার, আমি কনটেক্সটেই আছি। আপনি উত্তর দিন।'

স্যার বললেন—'এই ক্লাস থেকে রায়হান, মমতাজ, ফারহানা, সজীব, ওয়ারেস, ইফতি, সুমন, জাবেদ ও তুমি ফার্স্ট ক্লাস পাবে। আর বাকিরা সেকেন্ড ক্লাস পাবে।'

স্যার যাদের নাম বলেছেন, তারা সবাই ক্লাসের ব্রিলিয়্যান্ট স্টুডেন্ট। সুতরাং স্যারের অনুমান খুব একটা ভুল না।

আমি বললাম–'স্যার, আপনি এটা লিখে দিতে পারেন?'

– 'হোয়াই নট', স্যার বললেন।

এই বলে তিনি খচখচ করে একটা কাগজের একপাশে যারা ফার্স্ট ক্লাস পাবে তাদের নাম, অন্যপাশে যারা সেকেন্ড ক্লাস পাবে তাদের নাম লিখে আমার হাতে দিলেন।

আমি বললাম–'স্যার, ধরে নিলাম যে, আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে। মানে, আপনি ফার্স্ট ক্লাস পাবেন বলে যাদের নাম লিখেছেন, তারা সবাই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, আর যারা সেকেন্ড ক্লাস পাবে লিখেছেন, তাদের সবাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে।'

–'হুম, তো?'

–'এখন, স্যার বলুন তো প্লিজ, যারা ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, কেবলমাত্র আপনি এই কাগজে তাদের নাম লিখেছেন বলেই কি তারা ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে?'

–'নাহ তো।'

–'যারা সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে, কেবলমাত্র আপনি এই কাগজে লিখেছেন বলেই কি তারা সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে?'

স্যার বললেন–'একদম না।'

–'তাহলে মূল ব্যাপারটি কী স্যার?'

স্যার বললেন–'মূল ব্যাপার হলো, আমি তোমাদের শিক্ষক। আমি খুব ভালো জানি পড়াশোনায় তোমাদের কে কেমন। আমি খুব ভালো করেই জানি, কার মেধা কেমন। সুতরাং আমি চোখ বন্ধ করেই বলে দিতে পারি কে কেমন রেজাল্ট করবে।'

আমি হাসলাম। বললাম–'স্যার, যারা সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে, তারা যদি আপনাকে দোষ দেয়? যদি বলে, আপনি 'সেকেন্ড ক্লাস' ক্যাটাগরিতে তাদের নাম লিখেছেন বলেই তারা সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে?'

স্যার কপালের ভাঁজ লম্বা করে বললেন–'ইট উড বি টোট্যালি রং! আমি কেন এর জন্য দায়ী হবো? এটা তো সম্পূর্ণ তাদের দায়। আমি শুধু তাদের মেধা, যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা রাখি বলেই অগ্রীম বলে দিতে পেরেছি যে, কে কেমন রেজাল্ট করবে।'

আমি এবার জোরে জোরে হাসতে লাগলাম। পুরো ক্লাস আমার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে।

আমি থামলাম। বললাম–'স্যার, তাকদির তথা ভাগ্যটাও ঠিক এ রকম। আপনি যেমন আমাদের মেধা, যোগ্যতা, ক্ষমতা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন, স্রষ্টাও তেমনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে জানেন। আপনার ধারণা মাঝে মাঝে ভুল হতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার জানাতে কোনো ভুল নেই। স্রষ্টা হলেন আলিমুল গায়েব। তিনি ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব জানেন। সব।

'আপনি আমাদের সম্পর্কে পূর্বানুমান করে লিখে দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে কারা কারা ফার্স্ট ক্লাস পাবে, আর কারা সেকেন্ড ক্লাস পাবে। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, আপনি বলেছেন বলে আমরা কেউ ফার্স্ট ক্লাস পাচ্ছি, কেউ সেকেন্ড ক্লাস পাচ্ছি। আমরা যে যা রেজাল্ট করছি, সেটা তার মেধা, যোগ্যতা ও পরিশ্রমের আল্টিমেট ফল।

'তো স্রষ্টা যেহেতু তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে সব জানেন, কাজেই তিনি সে অনুযায়ী আমাদের তাকদির লিখে রেখেছেন। তাতে লেখা আছে দুনিয়ায় আমরা কে কী করব। এর মানেও কিন্তু এই নয় যে, তিনি লিখে দিয়েছেন বলেই আমরা কাজগুলো করছি। বরং এর মানে হলো এই–তিনি জানেন যে, আমরা দুনিয়ায় এই এই কাজগুলো করব। তাই তিনি তা অগ্রীম লিখে রেখেছেন তাকদির হিসেবে।

'আমাদের মধ্যে কেউ ফার্স্ট ক্লাস আর কেউ সেকেন্ড ক্লাস পাবার জন্য যেমন কোনোভাবেই আপনি দায়ী নন; ঠিক সেভাবে মানুষের মধ্যে কেউ ভালো কাজ করে জান্নাতে, আর কেউ খারাপ কাজ করে জাহান্নামে যাবার জন্যও স্রষ্টা দায়ী নন। স্রষ্টা জানেন যে, আপনি আজ সকালে একজনকে খুন করবেন। তাই তিনি সেটা আগেই আপনার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। এটার মানে এই নয় যে স্রষ্টা লিখে রেখেছেন বলেই আপনি খুনটি করেছেন। এর মানে হলো–স্রষ্টা জানেন যে, আপনি আজ খুনটি করবেন। তাই সেটা অগ্রিম লিখে রেখেছেন আপনার তাকদির হিসেবে। স্যার, ব্যাপারটা কি এখন পরিষ্কার?'

স্যারের চেহারা কিছুটা ফ্যাকাসে মনে হলো। তিনি বললেন–'হুম।'

এরপর স্যার কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন–'আমি শুনেছিলাম তুমি কদিন আগেও নাস্তিক ছিলে। তুমি আবার আস্তিক হলে কবে?'

আমি হা হা হা করে হাসলাম। বললাম–' স্যার এই প্রশ্নটা কিন্তু আউট অফ কনটেক্সট।'

এটা শুনে পুরো ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল। স্যার এবার ক্লাসের একাডেমিক লেকচার শুরু করলেন।

ক্লাসের একদম শেষদিকে স্যার আবার আমাকে দাঁড় করালেন। বললেন–'বুঝলাম স্রষ্টা আগে থেকে জানেন বলেই লিখে রেখেছেন। তিনি যেহেতু আগে থেকেই জানেন, কে ভালো কাজ করবে আর কে খারাপ কাজ করবে, তাহলে পরীক্ষা নেওয়ার কি দরকার? যারা জান্নাতে যাওয়ার তাদের জান্নাতে, আর যারা জাহান্নামে যাওয়ার তাদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেই তো হতো, তাই না?'

আমি আবার হাসলাম। আমার হাতে স্যারের লিখে দেওয়া কাগজটি তখনও ধরা ছিল। আমি সেটা স্যারকে দেখিয়ে বললাম–'স্যার, এই কাগজে কারা কারা ফার্স্ট ক্লাস পাবে, আর কারা কারা সেকেন্ড ক্লাস পাবে, তাদের নাম লেখা আছে। তাহলে এই কাগজটির ভিত্তিতেই রেজাল্ট দিয়ে দিন। বাড়তি করে পরীক্ষা নিচ্ছেন কেন?'

স্যার বললেন–'পরীক্ষা না নিলে কেউ হয়তো এই বলে অভিযোগ করতে পারে যে, স্যার আমাকে ইচ্ছা করেই সেকেন্ড ক্লাস দিয়েছে। পরীক্ষা দিলে আমি হয়তো ঠিকই ফার্স্ট ক্লাস পেতাম।'

আমি বললাম–'একদম তাই, স্যার। স্রষ্টাও এজন্য পরীক্ষা নিচ্ছেন, যাতে কেউ বলতে না পারে: দুনিয়ায় পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে আমি অবশ্যই আজকে জান্নাতে থাকতাম। স্রষ্টা ইচ্ছা করেই আমাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন।'

ক্লাসের সবাই হাততালি দিতে শুরু করল। স্যার বললেন–'সাজিদ, আই হ্যাভ অ্যা লাস্ট কোয়েশ্চান।'

–'ডেফিনেইটলি, স্যার।', আমি বললাম।

–'আচ্ছা, যে মানুষ পুরো জীবনে খারাপ কাজ বেশি করে, সে অন্তত কিছু না কিছু ভালো কাজ তো করে, তাই না?'

–'জ্বি স্যার।'

–'তাহলে, এই ভালো কাজগুলোর জন্য হলেও তো তার জান্নাতে যাওয়া দরকার, তাই না?'

আমি বললাম–'স্যার, পানি কীভাবে তৈরি হয়?'

স্যার আবার অবাক হলেন। হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন যে, এই প্রশ্নটাও আউট অফ কনটেক্সট। কিন্তু কী ভেবে যেন চুপসে গেলেন। বললেন–'দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেনের সংমিশ্রণে।'

আমি বললাম–'আপনি এক ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন দিয়ে পানি তৈরি করতে পারবেন?'

–'কখনোই না।'

–'ঠিক সেভাবে, এক ভাগ ভালো কাজ আর এক ভাগ মন্দ কাজে জান্নাত পাওয়া যায় না। জান্নাত পেতে হলে হয় তিন ভাগই ভালো কাজ হতে হবে, নতুবা দুই ভাগ ভালো কাজ, এক ভাগ মন্দ কাজ হতে হবে। অর্থাৎ, ভালো কাজের পাল্লা ভারী হওয়া আবশ্যক।'

সেদিন স্যার আর কোনো প্রশ্ন আমাকে করেননি।'

ডায়েরিতে সাজিদের লেখা এক নিশ্বাঃসে পুরোটা পড়ে ফেললাম। কোথাও একটুও থামিনি। পড়া শেষে যেই মাত্র ডায়েরিটা বন্ধ করতে যাবো, অমনি দেখলাম, পেছন থেকে সাজিদ এসে আমার কান মলে ধরেছে। বলল–'তুই তো সাংঘাতিক লেভেলের চোর। চুরি করে আমার ডায়রি পড়ছিস।'

আমি হেসে বললাম–'হা হা হা। ভুলে গেছিস যে, এই ডায়রি পড়ার এক্সেস তুই নিজেই আমাকে দিয়েছিলি!'

সাজিদ জিহ্বায় কামড় দিয়ে বলল–'সেটা আমার উপস্থিতিতে কিন্তু!'

আমি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিতে বললাম, 'স্যারকে তো সেদিন ভালো জব্দ করেছিস রে দোস্ত!'

কথাটা সে কানে নিল বলে মনে হলো না। নিজের সম্পর্কে কোনো কমপ্লিমেন্টই সে আমলে নেয় না। গামছায় মুখ মুছতে মুছতে খাটের উপর শুয়ে পড়ল।

আমি তার কাঁধে হাত রাখলাম। বললাম–'সাজিদ...'।

–'হু'

–'একটা কথা বলব?'

–'বল।'

–'জানিস, এক সময় যুবকেরা হিমু হতে চাইতো। হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে, মরুভূমিতে গর্ত খুঁড়ে জ্যোৎস্না দেখার স্বপ্ন দেখতো। দেখিস, এমন একদিন আসবে, যেদিন যুবকেরা সাজিদ হতে চাইবে। ঠিক তোর মতো।'

কথাগুলো বলেই আমি সাজিদের দিকে তাকালাম। দেখলাম, ততক্ষণে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। অঘোর ঘুম...। এক প্রশান্ত মুখের দিক থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারছি না।

# স্রষ্টা কেন মন্দ কাজের দায় নেন না?

মফিজুর রহমান স্যারের ক্লাস। স্যার হালকা-পাতলা গড়নের। বাতাস এলেই যেন ঢলে পড়বেন। খুবই খারাপ অবস্থা শরীরের। ভদ্রলোকের চেহারার চেয়ে চোখ দুটি অস্বাভাবিক রকম বড়। দেখলেই মনে হয় যেন বড় বড় সাইজের দুটি জলপাই কেউ খোদাই করে বসিয়ে দিয়েছে। তবে ভদ্রলোক খুবই ভালো মানুষ। উনার সমস্যা একটিই–ক্লাসে উনি যতটা না বায়োলজি পড়ান, তার চেয়ে বেশি দর্শন চর্চা করেন। ধর্ম কোথা থেকে এল, ঠিক কবে থেকে মানুষ ধার্মিক হওয়া শুরু করল, 'ধর্ম আদতে কী' আর, 'কী নয়' এসবই তার আগ্রহ ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

আজকে উনার চতুর্থ ক্লাশ। পড়াবেন Analytical Techniques & Bio-Informatics। চতুর্থ সেমিস্টারে এটা পড়ানো হয়।

স্যার এসে প্রথমে বললেন-'Good Morning, Guys.'

সবাই সমস্বরে বলল–'Good Morning, Sir.'

এরপর স্যার জিজ্ঞেস করলেন–'সবাই কেমন আছো?'

স্যারের আরও একটি ভালো দিক হলো–উনি ক্লাসে এলে এভাবেই সবার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। সাধারণত হায়ার লেভেলে যেটা সব শিক্ষক করেন না। তারা রোবটের মত ক্লাসে আসেন, যন্ত্রের মত করে লেকচার পড়িয়ে বেরিয়ে যান। সেদিক থেকে মফিজুর রহমান নামের এই ভদ্রলোক অনেকটা অন্যরকম।

আবারও সবাই সমস্বরে উত্তর দিল। কিন্তু গোলমাল বাঁধল এক জায়গায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন উত্তর দিয়েছে এভাবে–'আলহামদুলিল্লাহ্ ভালো।'

স্যার কপালের ভাঁজ একটু দীর্ঘ করে বললেন–'আলহামদুলিল্লাহ্ ভালো বলেছো কে কে?'

অদ্ভুত প্রশ্ন। সবাই থতমত খেলো।

একটু আগেই বলেছি স্যার একটু অন্যরকম। প্রাইমারি লেভেলের টিচারদের মত ক্লাসে এসে বিকট চিৎকার করে Good Morning বলেন, সবাই কেমন আছে জানতে চান। এখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার জন্য কি প্রাইমারি লেভেলের শিক্ষকদের মত বেত দিয়ে পিটাবেন না কি?

সাজিদের তখন তার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বাবুল চন্দ্র দাশের কথা মনে পড়ে গেল। এই লোকটা ক্লাসে কেউ দুটোর বেশি হাঁচি দিলেই বেত দিয়ে আচ্ছা মতো পেটাতেন। উনার কথা হলো–'হাঁচির সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে দুটি। দুটির বেশি হাঁচি দেওয়া মানে ইচ্ছে করেই বেয়াদবি করা।'

যা হোক, বাবুল চন্দ্রের পাঠ তো কবেই চুকেছে, এবার মফিজ স্যারের হাতেই না গণপিটুনি খাওয়া লাগে। ক্লাসের সর্বমোট সাতজন দাঁড়াল। এরা সবাই 'আলহামদুলিল্লাহ্ ভালো' বলেছে। এরা হচ্ছে–রাকিব, আদনান, জুনায়েদ, সাকিব, মরিয়ম, রিতা ও সাজিদ। স্যার সবার চেহারাটা একটু ভালো মত পরখ করে নিলেন। এরপর ফিক করে হেসে দিয়ে বললেন–'বসো।'

সবাই বসল। আজকে আর মনে হয় একাডেমিক পড়াশোনা হবে না। দর্শনের তাত্ত্বিক আলাপ হবে। ঠিক তাই হলো। মফিজুর রহমান স্যার আদনানকে দাঁড় করালেন। বললেন–'তুমিও বলেছিলে সেটা, না?'

–'জ্বি স্যার।', আদনান উত্তর দিল।

স্যার বললেন–'আলহামদুলিল্লাহ্র অর্থ কি জানো?'

আদনান মনে হয় একটু ভয় পাচ্ছে। সে ঢোঁক গিলতে গিলতে বলল–'জ্বি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ্ অর্থ হলো: সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ্র।'

স্যারও বললেন–'সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ্র।'

স্যার এই বাক্যটি দুবার উচ্চারণ করলেন। এরপর আদনানের দিকে তাকিয়ে বললেন–'বসো।'

আদনান বসল। এবার স্যার রিতাকে দাঁড় করালেন। স্যার রিতার কাছে জিজ্ঞেস করলেন–'আচ্ছা, পৃথিবীতে চুরি-ডাকাতি আছে?'

রিতা বলল–'আছে।'

–'খুন-খারাবি, রাহাজানি, ধর্ষণ?'

–'জ্বি,আছে।'

–'কথা দিয়ে কথা না রাখা, মানুষকে ঠকানো, লোভ-লালসা এসব?'

–'জ্বি, আছে।'

–'এগুলো কি প্রশংসাযোগ্য?'

–'না।'

'তাহলে মানুষ একটি ভালো কাজ করার পর তার সব প্রশংসা যদি আল্লাহ্‌র হয়, মানুষ যখন চুরি-ডাকাতি করে, লোক ঠকায়, খুন-খারাবি করে, ধর্ষণ করে, তখন সব মন্দের ক্রেডিট আল্লাহ্‌কে দেওয়া হয় না কেন ? উনি প্রশংসার ভাগ পাবেন, কিন্তু দুর্নামের ভাগ নিবেন না–তা কেমন একপেশে হয়ে গেল না?'

রিতা মাথা নিচু করে চুপ করে আছে। স্যার বললেন–'এখানেই ধর্মের ভেল্কিবাজি। ঈশ্বর শুধু ভালোটা বোঝেন, কিন্তু মন্দ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। আদতে, ঈশ্বর বলে কেউ নেই। যদি থাকত, তাহলে তিনি এরকম একচোখা হতেন না। বান্দার ভালো কাজের ক্রেডিটটা নিজে নিয়ে নিবেন, কিন্তু মন্দ কাজের বেলায় বলবেন–উহু, ঐটা থেকে আমি পবিত্র। ঐটা তোমার ভাগ।'

স্যারের কথা শুনে ক্লাসে যে কজন নাস্তিক আছে, তারা হাততালি দেওয়া শুরু করল। সাজিদের পাশে যে নাস্তিকটা বসেছে, সে তো বলেই বসল–'মফিজ স্যার হলেন আমাদের বাংলার প্লেটো।'

স্যার ধর্ম আর স্রষ্টার অসাড়তা নিয়ে বলেই যাচ্ছেন। এবার সাজিদ দাঁড়াল। স্যারের কথার মাঝে সে বলল–'স্যার, সৃষ্টিকর্তা একচোখা নন। তিনি মানুষের ভালো কাজের ক্রেডিট নেন না। তিনি ততোটুকুই নেন, যতটুকু তিনি পাবেন। ঈশ্বর আছেন।'

স্যার সাজিদের দিকে একটু ভালোভাবে তাকালেন। বললেন–'শিওর?'

–'জ্বি।'

–'তাহলে মানুষের মন্দ কাজের জন্য কে দায়ী?'

–'মানুষই দায়ী।', সাজিদ বলল।

–'ভালো কাজের জন্য?'

–'তা-ও মানুষ।'

স্যার এবার চিৎকার করে বললেন–'এক্সাক্টলি, এটাই বলতে চাচ্ছি। ভালো-মন্দ এসব মানুষেরই কাজ। সুতরাং এর সব ক্রেডিটই মানুষের। এখানে স্রষ্টার কোনো হাত নেই। তিনি এখান থেকে না প্রশংসা পেতে পারেন, না তিরস্কার। সোজা কথায়, স্রষ্টা বলতে কেউই নেই।'

ক্লাসে পিনপতন নীরবতা। সাজিদ বলল–'মানুষের ভালো কাজের জন্য স্রষ্টা অবশ্যই প্রশংসা পাবেন। কারণ মানুষকে স্রষ্টা ভালো কাজ করার জন্য দুটি হাত দিয়েছেন, ভালো জিনিস দেখার জন্য দুটি চোখ দিয়েছেন, চিন্তা করার জন্য মস্তিষ্ক দিয়েছেন, দুটি পা দিয়েছেন। এসবকিছুই স্রষ্টার দান। তাই ভালো কাজের জন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসা পাবেন।'

স্যার বললেন–'এগুলো দিয়ে তো মানুষ খারাপ কাজও করে, তখন?'

–'এর দায় স্রষ্টার নয়।'

–'হা হা হা। তুমি খুব মজার মানুষ দেখছি। একই সাথে কিছুটা বোকাও বটে! হা হা হা।'

সাজিদ বলল–'স্যার, স্রষ্টা মানুষকে একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। এটা দিয়ে সে নিজেই নিজের কাজ ঠিক করে নেয়। সে কি ভালো করবে, নাকি মন্দ করবে।'

স্যার তিরস্কারের সুরে বললেন–'ধর্মীয় কিতাবাদির কথা বাদ দাও। কাম টু দ্যা পয়েন্ট অ্যান্ড বি লজিক্যাল।'

সাজিদ বলল–'স্যার, আমি কি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি বিষয়টা?'

–'অবশ্যই।', স্যার বললেন।

সাজিদ বলতে শুরু করল–

'ধরুন, খুব গভীর সাগরে একটি জাহাজ ডুবে গেল। ধরুন, সেটা বার্মুডা ট্রায়াঙ্গাল। কোনো ডুবুরিই সেখানে ডুব দিয়ে জাহাজের মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে পারছে না। বার্মুডা ট্রায়াঙ্গালে তো নয়ই। এই মুহূর্তে ধরুন সেখানে আপনার আবির্ভাব ঘটল। আপনি সবাইকে বললেন–'আমি এমন একটি যন্ত্র বানিয়ে দিতে পারি, যেটা গায়ে লাগিয়ে যেকোনো মানুষ খুব সহজেই ডুবে যাওয়া জাহাজের মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে পারবে। ডুবুরির কোনো রকম ক্ষতি হবে না।'

স্যার বললেন–'হুম, তো?'

–'ধরুন, আপনি যন্ত্রটি তৎক্ষণাৎ বানালেন এবং একজন ডুবুরি সেই যন্ত্র গায়ে লাগিয়ে ডুবে যাওয়া মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে সাগরে নেমে পড়ল।'

ক্লাসে তখন একদম পিনপতন নীরবতা। সবাই মুগ্ধ শ্রোতা। কারও চোখের পলকই যেন পড়ছে না। সাজিদ বলে যেতে লাগল–'ধরুন, ডুবুরিটা ডুব দিয়ে ডুবে যাওয়া জাহাজে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে দেখল, মানুষগুলো হাঁসফাঁশ করছে। সে একে একে সবাইকে একটি করে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে দিল। তাদেরকে একজন একজন করে উদ্ধার করতে লাগল।'

স্যার বললেন–'হুম।'

সাজিদ বলছে–'ধরুন, সব যাত্রীকে উদ্ধার করা শেষ। বাকি আছে মাত্র একজন। ডুবুরি যখন শেষ লোকটাকে উদ্ধার করতে গেল, তখন দেখল, এই লোকটাকে সে আগে থেকেই চিনে।'

এতটুকু বলে সাজিদ স্যারের কাছে প্রশ্ন করল–'স্যার, এরকম কি হতে পারে না?'

স্যার বললেন–'অবশ্যই হতে পারে। লোকটা ডুবুরির আত্মীয় বা পরিচিত হয়ে যেতেই পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

সাজিদ বলল–'জ্বি। ডুবুরি লোকটাকে চিনতে পারল। সে দেখল, এটা হচ্ছে তার চরম শত্রু। এই লোকের সাথে তার দীর্ঘদিনের বিরোধ চলছে। এরকম হতে পারে না, স্যার?

–'হ্যাঁ, হতে পারে।'

সাজিদ বলল–'ধরুন, ডুবুরির মধ্যে ব্যক্তিগত হিংসাবোধ জেগে উঠল। সে শত্রুতাবশত ঠিক করল যে, এই লোকটাকে সে বাঁচাবে না। কারণ লোকটা তার দীর্ঘদিনের শত্রু। সে এই চরম সুযোগে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠল। ধরুন, ডুবুরি ঐ লোকটাকে অক্সিজেনের সিলিন্ডার তো দিলই না, উল্টো উঠে আসার সময় লোকটার পেটে একটা জোরে লাথি দিয়ে এল।'

ক্লাসে তখনও পিনপতন নীরবতা। সবাই সাজিদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

স্যার বললেন–'তো, তাতে কি প্রমাণ হয়, সাজিদ?'

সাজিদ স্যারের দিকে ফিরল। ফিরে বলল–'Let me finish my beloved sir'।

–'Okey, you are permitted. Carry on.', স্যার বললেন।

সাজিদ এবার প্রশ্ন করল–'স্যার, বলুন তো, এই যে, এতগুলো ডুবে যাওয়া মানুষগুলোকে ডুবুরি উদ্ধার করে আনল, এর জন্য আপনি নিজে কি কোনো ক্রেডিট পাবেন?'

স্যার বললেন–'অবশ্যই আমি ক্রেডিট পাবো। কারণ, আমি যদি ঐ বিশেষ যন্ত্রটি না বানিয়ে দিতাম, তাহলে তো এই লোকগুলোর কেউই বাঁচত না।'

সাজিদ বলল–'একদম ঠিক স্যার। আপনি অবশ্যই এর জন্য ক্রেডিট পাবেন। কিন্তু পরবর্তী ব্যাপার হচ্ছে, 'ডুবুরি সবাইকে উদ্ধার করলেও, একজন লোককে সে শত্রুতাবশত উদ্ধার না করে মৃত্যুকূপে ফেলে রেখে এসেছে। আসার সময় তার পেটে একটি জোরে লাথিও দিয়ে এসেছে। ঠিক?'

–'হুম।'

–'এখন স্যার, ডুবুরির এমন অন্যায়ের জন্য কি আপনি দায়ী হবেন? ডুবুরির এই অন্যায়ের ভাগটা কি সমানভাবে আপনিও ভাগ করে নেবেন?'

স্যার বললেন–'অবশ্যই না। ওর দোষের ভাগ আমি কেন নিব? আমি তো তাকে এরকম অন্যায় কাজ করতে বলিনি। সেটা সে নিজে করেছে। সুতরাং এর পুরো দায় তাকেই বহন করতে হবে।'

সাজিদ এবার হাসল। হেসে সে বলল–'স্যার, ঠিক একইভাবে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আপনি যেরকম ডুবুরিকে একটা বিশেষ যন্ত্র বানিয়ে দিয়েছেন, সেরকম সৃষ্টিকর্তাও মানুষকে অনুগ্রহ করে হাত, পা, চোখ, নাক, কান, মুখ, মস্তিষ্ক এসব দিয়ে দিয়েছেন। সাথে দিয়েছেন একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। এখন এসব ব্যবহার করে সে যদি কোনো ভালো কাজ করে, তবে তার ক্রেডিট স্রষ্টাও পাবেন। ঠিক যে রকম বিশেষ যন্ত্রটি বানিয়ে আপনি ক্রেডিট পাচ্ছেন। আবার সে মানুষ যদি এগুলো ব্যবহার করে কোনো খারাপ কাজ করে, গর্হিত কাজ করে, তাহলে এর দায়ভার স্রষ্টা নেবেন না। যে রকম ডুবুরির ঐ অন্যায়ের দায় আপনার উপর বর্তায় না। আমি কি বুঝাতে পেরেছি, স্যার?'

ক্লাসে এতক্ষণ ধরে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল। এবার ক্লাসের সকল আস্তিকেরা মিলে একসাথে জোরে জোরে হাততালি দেওয়া শুরু করল।

স্যারের জবাবের আশায় সাজিদ স্যারের দিকে তাকিয়ে আছে। স্যার বললেন–'হুম। আই গট দ্যা পয়েন্ট।', এই বলে স্যার সেদিনের এত ক্লাস শেষ করে চলে যান।

# শূন্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব

খুব সকালবেলা। সাজিদের কাছে একটি মেইল এসেছে। মেইলটি পাঠিয়েছে তার নাস্তিক বন্ধু বিপ্লব ধর। বিপ্লবদাকে আমিও চিনি। সদাহাস্য এই লোকটার সাথে মাঝে মাঝেই টিএসসিতে দেখা হতো। দেখা হলেই উনি একটি হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন–'তুই কি এখনো রাতের বেলা ভূত দেখিস?'

বিপ্লবদা মনে হয় হাসিটি প্রস্তুত করেই রাখত। দেখা হওয়া মাত্রই ডেলিভারি দিত। বিপ্লবদাকে চিনতাম সাজিদের মাধ্যমে। সাজিদ আর বিপ্লবদা একই ডিপার্টমেন্টের। বিপ্লবদা সাজিদের চেয়ে দুই ব্যাচ সিনিয়র। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিকে সাজিদ যে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিল, তার পেছনের কারিগর বিপ্লবদা। বিপ্লবদা তাকে বিভিন্ন নাস্তিক, অ্যাগনোস্টিকদের বই পড়িয়ে নাস্তিক বানিয়ে ফেলেছিল। সময়ের ব্যবধানে সাজিদ এখন আর নাস্তিক নেই। ইতোমধ্যে বিশ্বাসের দেয়ালে প্রথম চুমোটি দিয়ে ফেলেছে।

আমি ক্লাস শেষে রুমে ঢুকে দেখলাম সাজিদ বরাবরের মতই কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। কী যেন লিখছে। আমাকে দেখামাত্রই বলল–'তোর দাওয়াত আছে।'

–'কোথায়?', আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সাজিদ বলল–'বিপ্লবদা দেখা করতে বলেছেন।'

আমার সাথে উনার কোনো লেনদেন নেই। আমাকে এভাবে দেখা করতে বলার হেতু কি বুঝলাম না। সাজিদ বলল–'ঘাবড়ে গেলি নাকি? তোকে একা না, সাথে আমাকেও।'

এই বলে সাজিদ বিপ্লবদার মেইলটি ওপেন করে দেখাল। মেইলটি হুবহু এরকম–

'সাজিদ,

আমি তোমাকে একজন প্রগতিশীল, উদারমনসম্পন্ন, মুক্তমনা ভাবতাম। পড়াশোনা করে তুমি কথিত ধর্মীয় গোঁড়ামি আর অন্ধ বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসেছিলে। কিন্তু তুমি যে আবার সেই অন্ধ বিশ্বাসের জগতে ফিরে যাবে–সেটা কল্পনাও করিনি আমি। আজ বিকেলে বাসায় এসো। তোমার সাথে আলাপ আছে।'

আমরা খাওয়া-দাওয়া করে, যোহরের নামাজ পড়ে বিপ্লবদার সাথে দেখা করার জন্য বের হলাম। বিপ্লবদা আগে থাকতেন বনানী, এখন থাকেন কাঁটাবনে। জ্যাম কাটিয়ে আমরা যখন বিপ্লবদার বাসায় পৌঁছলাম, তখন আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। বিপ্লবদার সাথে হ্যান্ডশেক করে আমরা বসলাম না।

সাজিদ বলল–'দাদা, আলাপ একটু পরে হবে। আগে আসরের নামাজটা পড়ে আসি।'

বিপ্লবদা না করলেন না। আমরা বেরিয়ে গেলাম। পার্শ্ববর্তী মসজিদে আসরের নামাজ পড়ে ব্যাক করলাম। বিপ্লবদা ইতোমধ্যেই কফি তৈরি করে রেখেছেন। খুবই উন্নতমানের কফি। কফির গন্ধটা পুরো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তেই।

সাজিদ কফি হাতে নিতে নিতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল–'জানিস, বিপ্লবদার এই কফি বিশ্ববিখ্যাত। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কফি। বিপ্লবদা কানাডা থেকে অর্ডার করিয়ে আনেন।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে মনে হলো আসলেই সত্যি। এত ভালো কফি হতে পারে–ভাবাই যায় না। সাজিদ এবার বিপ্লবদার দিকে তাকিয়ে বলল–'আলাপ শুরু হোক।'

বিপ্লবদার মুখে সদাহাস্য ভাবটা আজকে নেই। উনার পরম শিষ্যের এরকম অধঃপতনে সম্ভবত মন কিছুটা বিষণ্ন।

বললেন–'তোমার সিদ্ধান্তের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তবে তোমাকে একটি বিষয়ে বলার জন্যই আসতে বলেছি। হয়তো তুমি ব্যাপারটি জেনে থাকবে, তবুও।'

সাজিদ কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল– 'জানা বিষয়টাও আপনার মুখ থেকে শুনলে মনে হয় নতুন জানছি। আমি আপনাকে কতটা পছন্দ করি, তা তো আপনি জানেনেই।'

বিপ্লবদা কোনো ভূমিকায় গেলেন না। সরাসরি বললেন–'ঐ যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা, উনার ব্যাপারে বলতে চাই। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তুমি হয়তো এ ব্যাপারে জানো। সম্প্রতি বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার কোনো ভূমিকা নেই। মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে শূন্য থেকেই। আগে তোমরা, মানে বিশ্বাসীরা বলতে, একটা সামান্য সুঁচও যখন কোনো কারিগর ছাড়া এমনি এমনি তৈরি হতে পারে না, তাহলে এই গোটা মহাবিশ্ব কীভাবে তৈরি হবে আপনা-আপনি? কিন্তু বিজ্ঞান এখন বলছে, এই মহাবিশ্ব শূন্য থেকে আপনা-আপনিই তৈরি হয়েছে। কারও সাহায্য ছাড়াই।'

এই কথাগুলো বিপ্লবদা এক নাগাড়ে বলে গেলেন। মনে হয়েছে তিনি কোনো নিঃশ্বাসই নেননি এতক্ষণ।

সাজিদ বলল– 'অদ্ভুত তো। তাহলে তো আমাকে আবার নাস্তিক হয়ে যেতে হবে দেখছি। হা হা হা হা।'

সাজিদ চমৎকার একটা হাসি দিল। বিপ্লবদা সেদিকে মনোযোগ দিয়েছেন বলে মনে হলো না। উনি মোটামুটি একটা লেকচার শুরু করেছেন। আমি আর সাজিদ খুব মনোযোগী ছাত্রের মতো উনার বৈজ্ঞানিক কথাবার্তা শুনছিলাম। তিনি যা বোঝালেন, তার সারসংক্ষেপ ঠিক এরকম।

–'পদার্থবিজ্ঞানে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সে একটি থিওরি আছে, সেটি হতে, 'কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান। এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মূল কথা হলো, 'মহাবিশ্বে পরম শূন্যস্থান বলে আদতে কিছু নেই। মানে, আমরা যেটাকে 'Nothing' বলে এতদিন জেনে এসেছি, বিজ্ঞান বলছে, আদতে 'Nothing' বলতে কিছুই নেই। প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না। তাই, যখনই কোনো শূন্যস্থান (Nothing) তৈরি হয়, সেখানে এক সেকেন্ডের বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে কণা এবং প্রতিকণা (Matter & Anti-Matter) তৈরি হচ্ছে এবং একটির সাথে অন্যটির ঘর্ষণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তোমরা কি জানো কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের ধারণা কোথা থেকে এসেছে?'

আমি বললাম–'না।'

বিপ্লবদা আবার বলতে শুরু করলেন–'এই ধারণা এসেছে হাইজেনবার্গের বিখ্যাত 'অনিশ্চয়তা নীতি' থেকে। হাইজেনবার্গের সেই বিখ্যাত সূত্রটা তোমরা জানো নিশ্চয়?'

সাজিদ বলল–'হ্যাঁ। হাইজেনবার্গ বলেছেন, আমরা কখনও একটি কণার অবস্থান এবং এর ভরবেগের সঠিক পরিমাণ একসাথে একুরেইটলি জানতে পারব না। যদি অবস্থান সঠিকভাবে জানতে পারি, তাহলে এর ভরবেগের মধ্যে গলদ থাকবে। আবার যদি ভরবেগ সঠিকভাবে জানতে পারি, তাহলে এর অবস্থানের মধ্যে গলদ থাকবে। দুটো একই সাথে সঠিকভাবে জানা কখনোই সম্ভব না। এটা যে সম্ভব না এটা বিজ্ঞানের অসাড়তা নয়, আসলে এটা হলো কণার ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য।'

বিপ্লবদা বললেন–'এক্সাক্টলি। একদম তাই। হাইজেনবার্গের এই নীতিকে শক্তি আর সময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। হাইজেনবার্গের এই নীতি যদি সত্যি হয়, তাহলে মহাবিশ্বে 'শূন্যস্থান' বলে কিছু থাকতে পারে না। যদি থাকে, তাহলে তার অবস্থান ও ভরবেগ দুটোই শূন্য চলে আসে, যা হাইজেনবার্গের নীতিবিরুদ্ধ।'

এইটুকু বলে বিপ্লবদা একটু থামল। কফির পট থেকে কফি ঢালতে ঢালতে বললেন–'বুঝতেছো তোমরা?'

সাজিদ বুঝছে কিনা জানি না, তবে আমার কাছে ব্যাপারটি দুর্বোধ্য মনে হলেও, বিপ্লবদার উপস্থাপন ভঙ্গিমা সেটাকে অনেকটাই প্রাঞ্জল করে তুলছে। ভালো লাগছে।

বিপ্লবদা কফিতে চুমুক দিলেন। এরপর আবার বলতে শুরু করলেন–'তাহলে তোমরা যে বলো, বিগ ব্যাং-এর আগে তো কিছুই ছিল না। না সময়, না শক্তি, না অন্যকিছু। তাহলে বিগ ব্যাং-এর বিস্ফোরণটি হলো কীভাবে? এর জন্য নিশ্চয় কোনো শক্তি দরকার? কোনো বাহ্যিক বল দরকার, তাই না? এটা বলে তোমরা স্রষ্টার ধারণাকে জায়েজ করতে। তোমরা বলতে, এই বাহ্যিক বলটা এসেছে স্রষ্টার কাছ থেকে। কিন্তু দেখো, বিজ্ঞান বলছে, এখানে স্রষ্টার কোনো হাত নেই। বিগ ব্যাং হবার জন্য যে-শক্তি দরকার ছিল, সেটা এসেছে এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান থেকে। সুতরাং, মহাবিশ্ব তৈরিতে স্রষ্টার অস্তিত্বকে বিজ্ঞান সরাসরি 'না' বলে দিয়েছে। আর তোমরা এখনো স্রষ্টা স্রষ্টা করে কোথায় যে পড়ে আছো, তা আমি বুঝতে পারি না।'

এতটুকু বলে বিপ্লবদার চোখমুখ ঝলমলিয়ে উঠল। মনে হচ্ছে, উনি যে-উদ্দেশ্যে আমাদের ডেকেছেন তা সফল হয়ে গেছে। আমরা হয়তো উনার বিজ্ঞানের উপর এই জ্ঞানগর্ভ লেকচার শুনে এক্ষুণি নাস্তিকতার উপর ঈমান নিয়ে আসব।

যাহোক, ইতোমধ্যে সাজিদ দুকাপ কফি গিলে ফেলেছে। নতুন এক কাপ ঢালতে ঢালতে সে বলল–'এই ব্যাপারে স্টিফেন হকিংয়ের বই আছে। নাম–'The Grand Design'। এটা আমি পড়েছি।'

সাজিদের কথা শুনে বিপ্লবদাকে খুব খুশি মনে হলো। তিনি বললেন–'বাহ, তুমি তাহলে পড়াশোনা স্টপ করোনি? বেশ বেশ! পড়াশোনা করবে। বেশি বেশি পড়বে। যত পড়বে, তত দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা বাড়বে।'

সাজিদ হাসল। হেসে সে বলল–'কিন্তু দাদা, এই ব্যাপারে আমার কনফিউশান আছে।'

–'কোনো ব্যাপারে?', বিপ্লবদার প্রশ্ন।

–'স্টিফেন হকিং আর লিওনার্ড ম্লোদিনোর বই 'The Grand Design'-এর ব্যাপারে।'

বিপ্লবদা একটু থতমত খেলো মনে হলো। সম্ভবত মনে মনে বলছেন–এই ছেলে দেখছি খোদার উপর খোদাগিরি করছে।

তিনি বললেন–'ক্লিয়ার করো।'

সাজিদ বলল—আমি দুই দিক থেকেই এটার ব্যাখ্যা করব। বিজ্ঞান ও ধর্ম। যদি অনুমতি দেন।'

–'অবশ্যই।', বিপ্লবদা বললেন।

আমি মুগ্ধ শ্রোতা। গুরু আর প্রাক্তন-শিষ্যের তর্ক জমে উঠেছে।

সাজিদ বলল—'প্রথম কথা হচ্ছে, স্টিফেন হকিংয়ের এই থিওরিটা এখনো 'থিওরি', সেটা 'ফ্যাক্ট' নয়। এই ব্যাপারে প্রথম কথা বলেন বিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস। তিনি এটা নিয়ে একটি বিশাল সাইজের বই লিখেছিলেন। বইটার নাম ছিল–'A Universe From Nothing'।

অনেক পরে, এখন স্টিফেন হকিংস এটা নিয়ে উনার 'The Grand Design'-এ কথা বলেছেন। উনার এই বইটা প্রকাশ হবার পর সিএনএনের এক সাংবাদিক হকিংকে জিজ্ঞেস করেছিলেন–'আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?'

হকিং বলেছিলেন–'ঈশ্বর থাকলেও থাকতে পারে, তবে মহাবিশ্ব তৈরিতে তার প্রয়োজন নেই।'

বিপ্লবদা বলল–'সেটাই। উনি বোঝালেন যে, ঈশ্বর মূলত ধার্মিকদের একটি অকার্যকর বিশ্বাস।'

–'হকিং কি বুঝিয়েছেন জানি না, কিন্তু হকিংয়ের ঐ বইটি অসম্পূর্ণ। কিছু বিতর্ক আছে।'

বিপ্লবদা কফির কাপ রাখতে রাখতে বললেন–'বিতর্ক? মানে?'

–'দাঁড়ান, বলছি। বিতর্ক মানে, উনি কিছু বিষয় বইতে পরিষ্কার করেননি। যেহেতু এটা বিজ্ঞান মহলে প্রমাণিত সত্য নয়, তাই এটা অনেক বিতর্কিত হয়েছে। উনার বইতে যে বিতর্কগুলো আছে, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বলছি।

**বিতর্ক নাম্বার: ০১**

'হকিং বলেছেন, শূন্য থেকেই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মাধ্যমে বস্তুকণা তৈরি হয়েছে এবং সেটা মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে নিউট্রালাইজ হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হলো–'শূন্য বলতে হকিং কি একদম Nothing (কোনোকিছুই নেই) বুঝিয়েছেন, নাকি Quantum Vaccum (বস্তুর অনুপস্থিতি) বুঝিয়েছেন সেটা পরিষ্কার করেননি। হকিং বলেছেন, শূন্যস্থানে বস্তুকণার মাঝে কোয়ন্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান হতে হলে সেখানে মহাকর্ষ বল প্রয়োজন। কিন্তু ঐ শূন্যস্থানে (যখন সময় আর স্থান তৈরি হয়নি) ঠিক কোথা থেকে এবং কীভাবে মহাকর্ষ বল এল, তার কোনো ব্যাখ্যা হকিং দেননি।

**বিতর্ক নাম্বার: ০২**

'হকিং তার বইতে বলেছেন, মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে একদম শূন্য থেকে, কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মাধ্যমে। তখন 'সময়' (Time)-এর আচরণ আজকের সময়ের এত ছিল না। তখন সময়ের আচরণ ছিল 'স্থান' (Space)-এর এত। কারণ এই ফ্ল্যাকচুয়েশান হওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে সময়ের দরকার ছিল না, স্থানের দরকার ছিল। কিন্তু হকিং তার বইতে এই কথা বলেননি যে, যে-সময় (Time) মহাবিশ্বের একদম শুরুতে 'স্থান'-এর মতো আচরণ করেছে, সেই-'সময়' পরে ঠিক কবে আর কখন থেকে আবার Time-এর মতো আচরণ শুরু করল এবং কেন?'

আমি বিপ্লবদার মুখের দিকে তাকালাম। তার চেহারার উৎফুল্ল ভাবটা চলে গেছে। সাজিদ বলে যাচ্ছে–

**বিতর্ক নাম্বার: ০৩**

'পদার্থবিদ্যার যে-সূত্র মেনে কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান হয়ে মহাবিশ্ব তৈরি হলো, তখন শূন্যাবস্থায় পদার্থবিদ্যার এই সূত্রগুলো বলবৎ থাকে কী করে?–এটার ব্যাখ্যা হকিং দেননি।

**বিতর্ক নাম্বার: ০৪**

'আপনি বলেছেন, প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না। তাই শূন্যস্থান পূরণ করতে আপনা-আপনিই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান হয়ে মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো–যেখানে আপনি শূন্যস্থান নিয়ে কথা বলছেন, যখন সময় ছিল না, স্থান ছিল না, তখন আপনি প্রকৃতি কোথায় পেলেন?'

সাজিদ হকিংয়ের বইয়ের পাঁচ নাম্বার বিতর্কের কথা বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে বিপ্লবদা বললেন–'ওকে, ওকে। বুঝলাম। আমি বলছি না যে, এই জিনিসটা একেবারে সত্যি। এটা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হবে। আলোচনা-সমালোচনা হবে। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। তারপর ডিসাইড হবে যে, এটা ঠিক না ভুল।'

সাজিদের কাছে বিপ্লবদার এরকম মৌন পরাজয় আমাকে খুব তৃপ্তি দিল। মনে মনে বললাম–'ইয়েস সাজিদ, ইউ ক্যান।'

সাজিদ বলল–'হ্যাঁ, সে পরীক্ষা চলতে থাকুক। যদি কোনোদিন এই থিওরি সত্যিও হয়ে যায়, তাহলেও আমাকে ডাক দিয়েন না দাদা। কারণ আমি কোরআন দিয়েই এটা প্রমাণ করে দিতে পারব।'

সাজিদের এই কথা শুনে আমার হেঁচকি উঠে গেল। কী বলে? এতক্ষণ যেটাকে গলদপূর্ণ বলেছে, সেটাকে আবার কোরআন দিয়ে প্রমাণ করবে বলছে? কীভাবে সম্ভব?

বিপ্লবদা বুঝল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন–'কী রকম?'

সাজিদ হাসল। বলল–'শূন্য থেকেই মহাবিশ্ব সৃষ্টির কথা আল-কোরআনে বলা আছে দাদা।'

আমি আরও অবাক হতে থাকলাম। কী বলে এই ছেলে?

সে বলল–'আমি বলছি না যে কোরআন কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের কথাই বলেছে। কোরআন যার কাছ থেকে এসেছে, তিনি তার সৃষ্টি জগতের সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখন সেটা বিগ ব্যাং এলেও পাল্টাবে না, কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান থিওরি এলেও পাল্টাবে না, একই থাকবে।'

বিপ্লবদা বলল–'কোরআনে কী আছে বললে যেন?'

সাজিদ বলল–'সূরা বাকারার ১১৭ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে–'যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনেন (এখানে মূল শব্দ 'বাদিয়্যু/Originator–সেখান থেকেই অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের ধারণা) এবং যখন তিনি কিছু করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন শুধু বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়।'

'Creator of the heavens and the earth from nothingness, He has only to say when He wills a thing, Be, and it is.

'দেখুন, আমি আবারও বলছি: আমি এটা বলছি না যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের কথাই বলেছেন। তিনি তার সৃষ্টির কথা বলেছেন। তিনি 'অনস্তিত্ব' (Nothing) থেকে 'অস্তিত্ব' (Something) এনেছেন। এমন না যে, আল্লাহ্ তার হাত দিয়ে প্রথমে মহাবিশ্বের ছাদ বানালেন। তারপর তাতে সূর্য, চাঁদ, গ্যালাক্সি এগুলো একটা একটা করে বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি কেবল নির্দেশ দিয়েছেন।

'হকিংও একই কথা বলেছেন। কিন্তু তারা বলছে এটা এমনি এমনি হয়ে গেছে; শূন্য থেকেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, না, এমনি হয়নি। আমি যখন নির্দেশ করেছি 'হও' (কুন), তখন তা হয়ে গেল।

'হকিং ব্যাখ্যা দিতে পারছে না–এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের জন্য মহাকর্ষ বল কোথা থেকে এল; 'সময়' কেন, কীভাবে 'স্থান' হলো, পরে আবার সেটা 'সময়' হলো। কিন্তু আমাদের স্রষ্টা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'হতে', আর তা হয়ে গেল।

ধরুন–একজন ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ম্যাজিশিয়ান বসে আছে স্টেজের এক কোণায়। কিন্তু সে তার চোখের ইশারায় ম্যাজিক দেখাচ্ছে। দর্শক দেখছে, খালি টেবিলের উপরে হঠাৎ একটা কবুতর তৈরি হয়ে গেল এবং সেটা উড়েও

গেল। দর্শক কী বলবে এটা কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মাধ্যমে হয়ে গেছে? না, বলবে না। এর পেছনে ম্যাজিশিয়ানের কারসাজি আছে। সে স্টেজের এক কোণা থেকে চোখ দিয়ে ইশারা করেছে বলেই এটা হয়েছে।

সৃষ্টির এই সূচনার ব্যাপারটাও এমন। তিনি শুধু বলেছেন, 'হও', আর মহাবিশ্ব আপনা-আপনিই হয়ে গেল। আপনাদের সেই শূন্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব কেবল ঐ 'হও' পর্যন্তই।

মাগরিবের আজান পড়তে শুরু করেছে। বিপ্লবদাকে অনেকটাই হতাশ হতে দেখলাম। আমরা বললাম–'আজ তাহলে উঠি?'

উনি একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন–'এসো।'

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি অবাক হয়ে সাজিদের দিকে তাকিয়ে আছি। কে বলবে এই ছেলেটা গত ছমাস আগেও নাস্তিক ছিল। নিজের গুরুকেই কী রকম কুপোকাত করে দিয়ে এল! কোরআনের সূরা বাকারার ১১৭ নাম্বার আয়াতটি কত শতবার পড়েছি, কিন্তু এভাবে কোনোদিন ভাবিনি। আজকে এটা সাজিদ যখন বিপ্লবদাকে বুঝিয়েছিল, মনে হচ্ছিল আজকেই নতুন শুনছি এই আয়াতের কথা। গর্ব হতে লাগল আমার।

# তাদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন। সত্যিই কি তাই?

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ছিলাম।

সাজিদ পড়ছিল অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের 'The Legacy Of Blood' বইটি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর বিদেশি সাংবাদিকের লেখা বই। সাজিদের অনেকদিনের ইচ্ছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর সে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করবে। তাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যত বই আছে, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে সে।

আমি অবশ্য সাজিদকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যই রয়ে গেছি। এসব বই-টই পড়ার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট অনীহা আছে। থার্ড পিরিয়ডে সাজিদ ফোন করে বলল ক্লাস শেষে যেন ওর সাথে দেখা করি। দেখা করতে এসেই আটকে গেছি। সোজা নিয়ে এল লাইব্রেরিতে। মোটা মোটা বইগুলো নিয়ে সে বসে পড়েছে। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে আর গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো ডায়েরিতে টুকে নিচ্ছে।

আমি আর কী করব? সাজিদকে মুখের উপর 'তুই বসে থাক' বলে চলেও আসা যাবে না। তাহলেই হয়েছে।

আমি ঘুরে ঘুরে সেলফে সাজিয়ে রাখা বইগুলো দেখছি। হুমায়ূন আহমেদের একটি বই হাতে নিলাম। বইটির নাম–'দিঘির জলে কার ছায়া গো।'

হুমায়ূন আহমেদ নামের এই ভদ্রলোক বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয় লেখক। যদিও উনার তেমন বই আমি পড়িনি, কিন্তু সাজিদের মুখে উনার বেশ প্রশংসা শুনি। উনার বেশকিছু কালজয়ী চরিত্র আছে। একবার নাকি উনার নাটকের একটি পট পাল্টানোর জন্য মানুষ মিছিল নিয়েও বেরিয়েছিল। বাব্বা! কি সাংঘাতিক!

'দিঘির জলে কার ছায়া গো' নামের বইটি উল্টাতে লাগলাম। উল্টাতে উল্টাতে একটি জায়গায় আমার চোখ আটকে গেল। বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইনের ব্যাপারে কিছু একটা লেখা। পড়তে শুরু করলাম–

'আহসানকে পেয়ে শওকত সাহেব আনন্দিত। তিনি নতুন একটা বই পড়ছেন।

বইয়ে বিবর্তনবাদের জনক ডারউইন সাহেবকে ধরাশায়ী করা হয়েছে। তাঁর পূর্বপুরুষ বানর–এটা তিনি মেনে নিতেই পারতেন না। এখন সমস্যার সমাধান হয়েছে। তিনি আহসানের দিকে ঝুঁকে এসে বললেন–'তুমি ডারউইনবাদে বিশ্বাস কর?'

আহসান বলল–'জ্বী চাচা, করি।'

–'তোমার বিশ্বাস তুমি এখন যে কোনো একটা ভালো ডাস্টবিন দেখে ফেলে আসতে পারো।'

আহসান বলল–' জ্বী আচ্ছা।'

–'পুরো বিষয়টা না শুনেই জ্বী আচ্ছা বলবে না। আগে পুরো বিষয়টা শোনো।'

আহসান হতাশভঙ্গিতে পুরো বিষয়টা শোনার জন্য প্রস্তুত হলো। সহজে এই বিরক্তিকর মানুষটার কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

শওকত সাহেব বললেন–'তোমাদের ডারউইনের থিওরি বলে পাখি এসেছে সরীসৃপ থেকে।

তুমি এখন একটা সাপ ও ময়ূর পাশাপাশি রাখো। চিন্তা কর যে, ময়ূরের পূর্বপুরুষ সাপ, যে সাপ এখন ময়ূয়ের প্রিয় খাদ্য। বলো, তোমার কিছু বলার আছে?'

–'এই মুহূর্তে কিছু বলার নেই চাচা।'

–'মনে মনে দশের ওপরে ৯৫০টা শূন্য বসাও।

এই বিশাল প্রায় অসীম সংখ্যা দিয়ে ১ কে ভাগ করো। কী পাবে জানো? শূন্য। এটা হলো অ্যাটমে অ্যাটমে ধাক্কাধাক্কি করে DNA অণু তৈরির সম্ভাবনা। মিলার নামে কোনো বিজ্ঞানীর নাম শুনেছো? ছাগলটাইপ সাইনটিস্ট।'

–'চাচা, শুনিনি।'

–'ঐ ছাগলটা ১৯৫০ সনে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে অন্য ছাগল সাইন্টিস্টদের মধ্যে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল। ছাগলটা করেছে কি, ল্যাবরেটরিতে আদি পৃথিবীর আবহাওয়া তৈরি করে ঘন ঘন ইলেকট্রিক কারেন্ট পাস করেছে। কিছু প্রোটিন অণু তৈরি করে বলেছে–এভাবেই পৃথিবীতে প্রাণের শুরু। প্রাণ সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার কোনো প্রয়োজন নেই। এখন সেই ছাগল মিলারকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে হাসাহাসি চলে। Life ম্যাগাজিনে কী লেখা হয়েছিল পড়ে শোনাই।'

–'চাচা, আরেকদিন শুনি? জটিল কিছু শোনার জন্য আমি এ মুহূর্তে মানসিকভাবে তৈরি না।'

–'জটিল কিছু বলছি না। জলবৎ তরলং। মন দিয়ে শোনো।'

শওকত সাহেব পড়তে শুরু করলেন। আহসান হতাশ চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল.......'

এতটুকু পড়ে আমি বেশ আনন্দ পেলাম। লেখক হুমায়ূন আহমেদ এখানে ব্যাটা ডারউইনকে একহাত নিলেন। শওকত সাহেবের মতো আমিও কোনোভাবেই মানতে পারি না যে, আমাদের পূর্বপুরুষ বানর। ভাবতেই ঘেন্না লাগে!

বইটি নিয়ে আমি সাজিদের কাছে গেলাম। এসে দেখি সে ব্যাগপত্র গোছানো শুরু করেছে। সে বলল–'চল, বাসায় যাবো।'

আমি তাকে হাতের বইটি দেখিয়ে বললাম–'এই বইটা পড়েছিস? মজার একটি কাহিনী আছে। হয়েছে কি জানিস...?'

আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সাজিদ বলল–'শওকত সাহেব নামের এক ভদ্রলোক আহসান নামের একটি ছেলের সামনে ডারউইনের গোষ্ঠী উদ্ধার করেছে, তাই তো?'

আমি অবাক হলাম। বললাম–'হ্যাঁ। কিন্তু আমি এই ব্যাপারে বলব কী করে বুঝলি?'

সাজিদ ব্যাগ কাঁধে নিতে নিতে বলল–'এটা ছাড়া এই বইতে আর তেমন বিশেষ কিছু নেই, যেটা দেখাতে তুই এভাবে আমার কাছে ছুটে আসবি। তাই অনুমান করলাম।'

আমি আর কিছুই বললাম না। বইটি শেলফে রেখে দিয়েই হাঁটা ধরলাম।

সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ বিপ্লবদার সাথে দেখা।

উনার সাথে শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল উনার বাসায়। সেবার সাজিদ আর বিপ্লবদার মধ্যে কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে যা বিতর্ক হয়েছিল, দেখার মতো। বিতর্কে বিপ্লবদা সাজিদের কাছে গো হারা হেরেছিল। সেটা ভাবতেই এখনো আমার পৈশাচিক আনন্দ হয়।

আমাদের দেখেই বিপ্লবদা হেসে দিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন।

এর মধ্যে হঠাৎ করে বৃষ্টি চলে এল। মধ্যাকাশে সূর্য্যি মামা তখনও বহাল তবিয়তে জ্বলজ্বল করছে, আবার ওদিকে বৃষ্টির বিশাল বিশাল ফোঁটা। গ্রাম্য লোকজনের কাছে এই বৃষ্টির একটি মজার ব্যাখ্যা আছে। তারা বলে, শিয়ালের বিয়ে হলে এরকম বৃষ্টি হয়। রোদের মধ্যেই বৃষ্টি। শিয়াল প্রজাতির মধ্যে বিয়ের প্রচলন আছে কিনা কে জানে।

বিপ্লবদাসহ আমরা ক্যান্টিনে ঢুকলাম। বৃষ্টি কমলে বের হতে হবে।

সাজিদ তিন কাপ চা অর্ডার করল। এরপর বিপ্লবদার দিকে তাকিয়ে বলল–'দাদা ভাই, চা খেতে অসুবিধে নেই তো?'

–'না না, ইট'স ওকে', বিপ্লবদা উত্তরে বলল।

এরপর আবার বিপ্লবদা বলল–'সাজিদ, তোমার সাথে একটি ব্যাপারে আলাপ করার ছিল।'

ততক্ষণে চা চলে এসেছে। বৃষ্টির মধ্যে গরম গরম ধোঁয়া উঠা চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ফ্লেভারটাই অন্যরকম। সাজিদ তার কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল–'হ্যাঁ দাদা, বলুন। কোন টপিক?'

বিপ্লবদা বলল–'ঐ যে, তোমরা যে বইটাকে স্রষ্টার বাণী বলো, সেটা নিয়ে। কোরআন।'

সাজিদ বলল–'সমস্যা নেই। বলুন কী বলবেন?'

বিপ্লবদা বললেন–'কোরআনে একটা সূরা আছে। সূরাটার নাম বাক্‌রা।'

সাজিদ বলল–'সূরাটির নাম বাক্‌রা নয়, বাকারা। বাকারা অর্থ–গাভী। ইংরেজিতে The Cow...'

–'ওই আর কি। এই সূরার ৬-৭ নাম্বার লাইনগুলো তুমি কি পড়েছ?'

–'পুরো কোরআনই আমরা মাসে কয়েকবার করে পড়ি। এটা মার্কস কিংবা প্লেটোর রচনা নয় যে, একবার পড়া হয়ে গেলেই শেলফে আজীবনের জন্য সাজিয়ে রাখব।'

বিপ্লবদা বললেন–' এই লাইনগুলোতে বলা হচ্ছে:

"Verily, those who disbelieve, it is the same to them whether you warn them or do not warn them, they will not believe.

Allah has set a seal on their hearts & on their hearings, and on their eyes there is a covering. Theirs will be a great torment." (Baqara 6-7)

এরপর বিপ্লবদা সেটার বাংলা অর্থ করে বললেন–

"নিশ্চয় যারা অস্বীকার করে, তাদের আপনি সাবধান করুন আর না করুন, তারা স্বীকার করবে না। আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে এবং তাদের কর্ণ কুহরে মোহর মেরে দিয়েছেন; তাদের দৃষ্টির ওপর আবরণ টেনে দিয়েছেন। তাদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি।"

এইটুকু বলে বিপ্লবদা থামলেন। সাজিদ বলল–'Whats wrong with these verses?'

বিপ্লবদা বললেন–'দেখো, এখানে বলছে কাফিরদের হৃদয়ে আর কানে তোমাদের আল্লা মোহর আই মিন সিল মেরে দেয়। সিল মারা মানে তালাবদ্ধ করে দেওয়া, তাই না?'

–'হু।'

–'এখন কাফিরদের হৃদয়ে আর কানে যদি সিল মারা থাকে, তারা তো সত্যের বাণী, আই মিন তোমরা যেটাকে ধর্মের বাণী বলো আর কি, সেটা বুঝতে পারবে

না। উপলব্ধি করতে পারবে না। আল্লা যেহেতু তাদের হৃদয়ে আর কানে সিল মেরে দিচ্ছে, তাই তারা ধর্মের বাণীগুলো বুঝতে পারছে না। তাই তারা কাফির থেকে যাচ্ছে। নাস্তিক হচ্ছে। তাদের কি দোষ বলো? আল্লাই তো চান না তারা আস্তিক হোক। চাইলে তিনি নিশ্চয় হৃদয়ে আর কানে সিল মেরে দিতেন না। আবার, শেষে এসে বলছে, তাদের জন্য আজাব অপেক্ষা করছে। এটা কেমন কথা? একদিকে সিল মেরে দিয়ে সত্য বোঝার থেকে দূরে রাখছেন, আবার ওই দিকে আজাবও প্রস্তুত করে রাখছেন। ব্যাপারটা কি ঠিক? বলো?'

বিপ্লবদার কথাগুলো আমার কাছে খুব যৌক্তিক মনে হলো। আসলেই তো। এই আয়াতগুলো নিয়ে তো এভাবে কোনোদিন ভাবিনি। আল্লাহ্ একদিকে বলছেন কাফিরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, আবার তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ব্যাপারটা কী?

সাজিদ মুচকি হাসল। চায়ের কাপে শেষ চুমুকটুকু দিয়ে বলল–'দাদা, ইসলামের ইতিহাস পড়লে আপনি একশ্রেণির মীরজাফরদের কথা জানতে পারবেন। এরা করত কি জানেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসত। হাতের মুঠির মধ্যে পাথর নিয়ে বলত–মুহাম্মাদ, আমার হাতে কি আছে বলতে পারলে আমি এক্ষুণি ইসলাম কবুল করব। দেখি তুমি কেমন নবী?

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসতেন। হেসে বলতেন–তোমার হাতের জিনিসই বলুক সেগুলো কি।

'তখন পাথরগুলো কথা বলতে শুরু করত। এটা দেখে সেই লোকগুলো খুব অবাক হতো। অবাক হয়ে বলত–এ তো সাক্ষাৎ জাদুকর। এই বলে পালাত। অথচ, তারা বলেছিল হাতে কি আছে বলতে পারলে ইসলাম কবুল করবে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পরীক্ষায় পাশ করে গেলে তারা তাকে জাদুকর, জ্যোতিষী ইত্যাদি বলে চলে যেত। মুনাফিকি করত। এসব আয়াতে মূলত এই শ্রেণির কাফিরদের কথাই বলা হয়েছে। যাদের সামনে সত্য উদঘাটিত হওয়ার পরও তারা তা অস্বীকার করে।'

বিপ্লবদা বললেন–'কিন্তু অন্তরে মোহর মেরে দিয়ে তাদের সত্য জানা থেকে বঞ্চিত করে, আবার তাদের শাস্তি দেওয়াটা কি ঠিক?'

–'মোহর আল্লাহ্ ইচ্ছে করে মেরে দেন না। এটা সিস্টেমেটিক্যালি হয়ে যায়।'

বিপ্লবদা হাসা শুরু করলেন। বললেন–'Very Interesting! সিস্টেমেটিক্যালি সিল পড়ে যায়? হা হা হা।'

সাজিদের এই কথাটা আমার কাছেও শিশুসুলভ মনে হলো। সিস্টেমেটিক্যালি সিল পড়ে যায়? আল্লাহ্ মারেন না। এটা কেমন কথা? আয়াতে তো স্পষ্টই আছে–'আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।'

সাজিদ বলল–'দাদা, ধরুন, আমি বললাম, যারা খাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে, আপনি তাদের খেতে বলুন আর না বলুন, তারা কোনোভাবেই খাবে না। আল্লাহ্ তাদের দেহ শুকিয়ে দেন। তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেন। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন অসুখ।

'খেয়াল করুন–এখানে তারা অসুস্থ হচ্ছে, তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, তারা কঠিন অসুখে পড়তে যাচ্ছে–কেন এসব হচ্ছে? আল্লাহ্ কি ইচ্ছা করেই তাদের সাথে এগুলো করছেন? নাহ। এগুলো তাদের কর্মফল। তাদের যতই জোর করা হোক, তারা যখন কোনোভাবেই খাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে, তখন সিস্টেমেটিক্যালি না খাওয়ার ফলে তাদের শরীর শুকিয়ে যাবে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে। তারা কঠিন রোগে পড়বে। এসবকিছুর জন্য তারাই দায়ী। কিন্তু, সিস্টেমটা আল্লাহ্ই চালাচ্ছেন। আল্লাহ্ একটি সিস্টেম রেডি করে দিয়েছেন। আপনি না খেলে আপনার শরীর আল্লাহ্ শুকিয়ে দেবেন। আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেবেন। দিনশেষে, আপনার একটি কঠিন রোগ হবে। এটা একটা সিস্টেম। এই সিস্টেমে আপনি তখনই পড়বেন, যখন আপনি নিজ থেকে খাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন।

'ঠিক সেভাবেই, যারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে, তাদের সামনে যত প্রমাণ, যত দলিলই আসুক, তারা সত্যকে মেনে নিবে না, অস্বীকার করবেই করবে, তাদের অন্তরে আর কানে সিস্টেমেটিক্যালি একটি সিল পড়ে যাচ্ছে। না খাওয়ার ফলে আপনি যেভাবে শুকিয়ে যান, আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, আপনার কঠিন অসুখ হয়, ঠিক সেভাবে, বিশ্বাস করবেন না বলে সিদ্ধান্ত যখন নিয়েই ফেলেছেন, তখন আপনার অন্তরে, কানে সিল পড়ে যাচ্ছে, আর দিন শেষে, আপনার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন অসুখ, আই মিন আজাব। এর জন্য আল্লাহ্কে ব্লেইম করা হবে কেন?'

সাজিদ একনাগাড়ে বলে গেল কথাগুলো। বিপ্লবদার মুখ খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি সম্ভবত বুঝে গেছেন ব্যাপারটা।

আমি বললাম–'বাব্বা! কী দিয়ে কী বুঝিয়ে দিলি রে ভাই। আমি হলে তো হ-য-ব-র-ল করে ফেলতাম।'

সাজিদ মুচকি হাসল।

বৃষ্টি অনেকক্ষণ আগেই থেমে গেছে। আমরা বিপ্লবদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম সেদিন।

# মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো... অতঃপর

নীলাঞ্জনদা মনেপ্রাণে একজন খাঁটি বাংলাদেশি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তি সংগ্রামকে তিনি কোনো কিছুর সাথে কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নন। সাজিদের সাথে নীলাঞ্জনদার খুবই ভালো সম্পর্ক। নীলাঞ্জনদাকে আমরা ভালোবেসে নিলুদা বলেই ডাকি। উনি একাধারে কবি, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক।

আজকে সাজিদের সাথে নিলুদার একটি বিশেষ আলাপ হবে। কয়েকদিন আগে নিলুদা ব্লগে আল কোরআনের একটি আয়াতকে 'সন্ত্রাসবাদী আয়াত' বলে কটাক্ষ করে পোস্ট করেছে। সে ব্যাপারে সুরাহা করতে নিজ থেকেই নিলুদার বাসায় যাচ্ছি আমরা।

আমরা বিকেল চারটায় নিলুদার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। উনার বাসায় এর আগে কখনো আসিনি। উনার সাথে দেখা হতো প্রেসক্লাব আর বিভিন্ন প্রোগ্রামে। তবে, উনি যে নীলক্ষেতে থাকেন, সেটা জানি।

নীলক্ষেতে এসে সাজিদ নিলুদাকে ফোন দিল। ওপাশ থেকে সুন্দর একটি রিংটোন বেজে উঠল। রিংটোনে সেট করা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের সেই বিখ্যাত ভাষণ।

সাজিদ ফোনের লাউড স্পিকার অন করে দিল। আমরা আবার শুনলাম, বঙ্গবন্ধুর সেই চিরচেনা ভাষণ। বঙ্গবন্ধু বলছেন–'আমরা তাদের ভাতে মারব, আমরা তাদের পানিতে মারব। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

পর পর দুবার রিং হওয়ার পর তৃতীয়বারে নিলুদা ফোন রিসিভ করলেন। সাজিদকে নিলুদা ভালোভাবে বাসার ঠিকানা বুঝিয়ে দিলেন। আমরা ঠিকঠাক পৌঁছে গেলাম।

বাইরে থেকে কলিংবেল বাজতেই বুড়ো মতো এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিল। আমরা ভেতরে গেলাম।

বলে নিই, আমরা যে-উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, সেটা নিলুদাকে জানানো হয়নি। নিলুদার একটি গুণের কথা বলা হয়নি। কবিতা লেখা এবং সাংবাদিকতার পাশাপাশি নিলুদা খুব ভালো ছবিও আঁকেন।

আমরা ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই বুড়ো লোকটি আমাদের সোজা নিলুদার রুমে নিয়ে গেল। মনে হয়, উনার উপর এই নির্দেশই ছিল।

আমরা নিলুদার রুমে এসে দেখি উনি ছবি আঁকছেন। মুক্তিযুদ্ধের ছবি। প্রায়ই আঁকা হয়ে গেছে।

জলপাই রঙা পোশাকের একজন মিলিটারি। মিলিটারির বাম হাতে একটি রাইফেল। একজন অর্ধনগ্ন মহিলা। মহিলার চুল খোলা। মহিলা বেঁচে নেই। মিলিটারিটা মহিলাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হয় ভাগাড়ে নিক্ষেপ করবে–এরকম কিছু। পাশেই একটি ডাস্টবিন টাইপ কিছু। চারটে কাক বসে আছে সেটার উপর। জয়নুলের 'দূর্ভিক্ষ' ছবিটার মতোই।

আমাদের দিকে না ফিরেই নিলুদা বললেন–'কিরে, এত ঘটা করে দেখা করতে এসেছিস যে?'

সাজিদ বলল–'ও মা, তোমার সাথে দেখা হয় না কতদিন, দেখতে মন চাইল বলে চলে এলাম। ডিস্টার্ব করেছি বুঝি?'

–'আরে না না, তা বলিনি।', এটুকু বলে নিলুদা ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। আমাকে দেখে নিলুদা বলে উঠল–'আরিফ না?'

–'হুঁ', সাজিদ বলল।

–'ওরে বাবা! আজ দেখি আমার বাসায় চাঁদের হাট। তুমি তো জম্পেশ কবিতা লিখো ভাই আরিফ। বিচিত্রায় তোমার কবিতা আমি প্রায়ই পড়ি।'

নিলুদার মুখে এরকম কথা শুনে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। সাজিদ বলল–'জানো দাদা, তাকে কত করে বলি, বইমেলার জন্যে কবিতার একটা পাণ্ডুলিপি রেডি কর। কিন্তু সে বলে, ওর নাকি ভয় করে। দেখো তো দাদা।'

নিলুদা বলল–'হ্যাঁ হ্যাঁ, পান্ডুলিপি রেডি করো। একবার বই বের হয়ে গেলে দেখবে ভয়টয় সব দৌড়ে পালাবে। তোমার লেখার হাত দারুণ। আমি পড়ি তো। বেশ ভালো লিখো।'

সাজিদ বলল–'দাদা, ওটা কি মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক ছবি? যেটা আঁকছ?'

–'হুঁ', নিলুদার উত্তর।

–'আচ্ছা দাদা, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার বিশেষ পড়াশোনা নেই। তুমি তো আবার এই লাইনের। আজ তোমার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনব।'

নিলুদা মুচকি হাসলেন। তুলির শেষ আঁচড়খানা দিয়ে খাটের উপর উঠে বসলেন। আমরা দুজন ততক্ষণে দুটি চেয়ারে বসে পড়েছি।

বুড়ো ভদ্রলোক ট্রেতে কফি নিয়ে এসেছেন। নিলুদা কফিতে চুমুক দিতে দিতে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা শুরু করলেন–

'১৯৭১ সাল। পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিল বাঙালিরা। যখনই তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার হয়েছে, তখনই পাকিস্তানিরা বাঙালিদের উপর চালিয়েছে অত্যাচার, নির্যাতন।'

নিলুদার কণ্ঠ ভারী হয়ে এল। মুক্তিযুদ্ধের আলাপ উঠলেই উনি এরকম আবেগপ্রবণ হয়ে যান। তিনি বলে যাচ্ছেন–'এই অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা এতই ভয়াবহ হয়ে উঠল যে, বাঙালিরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের এবং নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হলো।

'তখন চলছে উত্তাল মার্চ মাস। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলা ও বাঙালি জাতির কর্ণধার, ইতিহাসের বরপুত্র, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিলেন।'

সাজিদ বলল–'দাদা, তোমার ফোনের রিংটোন আবার একবার শুনি তো প্লিজ। আমরা তাদের ভাতে মারব, আমরা তাদের পানিতে মারব।

'বাবারে! কি সাংঘাতিক কথা।'

নিলুদা কপালের ভাঁজ দীর্ঘ করে বললেন–'সাংঘাতিক বলছিস কেন? বরং বল, এটিই হলো বাঙালির মহাকাব্য। সেদিন এরকম করে বাঙালিদের অনুপ্রাণিত না করলে আমরা কি স্বাধীনতার স্বাদ পেতাম?'

–'তাই বলে মেরে ফেলার কথা? এটা তো আইন হাতে তুলে নেওয়ার মতো ব্যাপার।', সাজিদ বলল।

নিলুদা বলল–'যেখানে নিজেদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবার পথে, সেখানে তুই আইন বানাচ্ছিস? যুদ্ধের ময়দানে কোনো আইন চলে না।'

–'তারপর?'

–'বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধে।'

আমি বললাম–'তারা পাকিস্তানিদের মারল এবং মরল, তাই না?'

–'হ্যাঁ।'

–'যুদ্ধের পরে 'আমরা তাদের ভাতে মারব, পানিতে মারব' অথবা, 'যার যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো' এরকম কথার জন্য বঙ্গবন্ধুকে কি জেল খাটতে হয়েছে? কিংবা কেউ তাকে সন্ত্রাসের উস্কানিদাতা বা খুনের মদদদাতা হিসেবে ব্লেইম করেছে?', সাজিদ জিজ্ঞেস করল।

–'তোর মাথায় কি গোবর নাকি রে সাজিদ? এটা কোনো কথা বললি? এটার জন্য স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে ব্লেইম করবে কেন? যুদ্ধের ময়দানে এটা ছিল একজন কমান্ডারের কমান্ড। এটা অপরাধ নয়। বরং এটার জন্য তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। নির্যাতিত বাঙালিদের মুক্তির দিশারি, মহান নেতা বঙ্গবন্ধু। এভাবে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা পেলাম একটি স্বাধীন ভূখণ্ড। একটি স্বাধীন পতাকা।'

–' আমিও একমত। বঙ্গবন্ধু একদম ঠিক কাজটিই করেছেন। আচ্ছা দাদা, ঠিক একই কাজ অর্থাৎ নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, দলিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য পৃথিবীর অন্য কোথাও যদি অন্য কোনো নেতা এরকম কথা বলে, তাহলে তুমি কি মনে করবে? অন্য কোনো নেতা যদি বলে–'শত্রুদের যেখানেই পাও, হত্যা করো। আর এই কমান্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি নির্যাতিত মানুষগুলো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তুমি সেটাকে কোন চোখে দেখবে?'

–'অবশ্যই আমি ঐ নেতার পক্ষে থাকব এবং তার এই কথার, এই কাজের প্রশংসা করব।', নিলুদা বললেন।

–'যেমন?'

–'যেমন আমি চে গুয়েভারার সংগ্রামকে স্বাগত জানাই, আমি যোসেফ স্ট্যালিন, মাও সে তুংয়ের সংগ্রামকে স্বাগত জানাই। এরা সবাই নির্যাতিতদের অধিকারের জন্য লড়েছেন।'

এবার সাজিদ বলল–'দাদা, আপনি আরবদের ইতিহাস জানেন?'

–'কী রকম?'

–'চৌদ্দ শ বছর আগের কথা। আরবের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিপরীতে একটি নতুন ধর্মবিশ্বাস সেখানে মাথা তুলে দাঁড়ায়।'

–'হু।'

–'কিছু মানুষ স্বেচ্ছায়, কোনোরকম জোরজবরদস্তি ছাড়াই এই ধর্মটির প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ে। তারা দলে দলে এই ধর্মবিশ্বাস মেনে নিতে শুরু করে। কিন্তু সমাজপতিদের এটা সহ্য হয়নি। যারা যারা এই ধর্মটিকে মেনে নিচ্ছিলো, তাদের উপরই নেমে আসছিল অকথ্য নির্যাতন। বুকের উপর পাথর তুলে দেওয়া, উটের পেছনে রশি দিয়ে বেঁধে মরুভূমিতে ঘুরানো, গর্দান নিয়ে নেওয়ার এত ঘটনাসহ আরও কত কি। একপর্যায়ে এই ধর্মের প্রচারক এবং তার সঙ্গী-সাথীদের দেশ ছাড়া করা হলো। এমন কোনো নির্যাতন নেই, যা তাদের উপর নেমে আসেনি। স্বদেশহারা, স্বজনহারা হয়ে তারা তখন বিধ্বস্ত। ৭১-এ আমাদের শত্রু যেমন ছিল পাকিস্তান, ১৪০০ বছর আগের সে সময়টায় মুসলিমদের শত্রু ছিল মুশরিকরা।

তাহলে এই অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, তাদের নেতা যদি ঘোষণা দেয়: তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাও, হত্যা করো, তাহলে দাদা এতে কি কোনো অপরাধ, কোনো সন্ত্রাসবাদ প্রকাশ পায়?'

নিলুদা চুপ করে আছে।

সাজিদ বলে যেতে লাগল–'বঙ্গবন্ধুর আমরা তাদের ভাতে মারব, পানিতে মারব' যদি বাঙালির মহাকাব্য হয়, এটা যদি সন্ত্রাসবাদে উস্কানি না হয়, তাহলে আরেকটি যুদ্ধের ঘোষণাস্বরূপ বলা: 'তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো' এই কথাটা কেন সন্ত্রাসবাদী কথা হবে? এটি কেন জঙ্গীবাদের উস্কানি হবে?

'হত্যার নির্দেশ দেওয়ার পরের আয়াতেই বলা আছে: 'মুশরিকদের কেউ যদি তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দাও।'

'আপনি চে গুয়েভারা, যোসেফ স্ট্যালিন, মাও সে তুংয়ের কথা বললেন, তাদের কেউ কি বলেছে: কেউ এসে আমাদের কাছে আশ্রয় চাইলে, আমরা তাদের নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় দেব। বলেছিল? বলেনি। পৃথিবীর কোনো কমান্ডার শত্রুদের এরকম নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার কথা বলেনি। বরং নির্দেশ দেয়: দেখা মাত্রই গুলি কর।'

নিলুদা বলল–'হু।'

সাজিদ বলল–'দাদা, কোরআনে আরও আছে, 'যে বিনা অপরাধে কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে খুন করল, সে যেন পুরো মানবজাতিকেই খুন করল।' এরকম একটি কথা, পৃথিবীর কোনো মানুষ, কোনো নেতা, কোনো গ্রন্থে কি আছে? নেই।

'৭১ এ জালিম পাকিস্তানিদের মারার ঘোষণা দিয়ে বঙ্গবন্ধু আমাদের কাছে মহানায়ক, তাহলে ১৪০০ বছর আগে, এরকম ঘোষণা আরেকজন দিয়ে থাকলে, তিনি কেন খলনায়ক হবেন? অপরাধী হবেন? একই কথা, একই নির্দেশের জন্য আপনি একজনকে মহামানব মনে করেন, অন্যজনকে মনে করেন সন্ত্রাসী, কেন দাদা? স্রেফ কি ধর্ম বিরোধিতার জন্য?

'একজনের এরকম ঘোষণাকে ফোনের রিংটোন করে রেখেছেন, অন্যজনের এরকম ঘোষণাকে সন্ত্রাসবাদী কথাবার্তা, জঙ্গীবাদী কথাবার্তা বলে কটাক্ষ করে লেখা লিখেন, কেন? এটা কি ফেয়ার, দাদা?'

–'হুম। আসলে আমি এমন করে বলিনি।' নিলুদা কিছুটা একমত।

সাজিদ বলল–'দাদা, অনেক নাস্তিককে কোরআনের একটি আয়াতকে অন্য আয়াতের সাথে কন্ট্রাডিক্টরি বলতে দেখেছি। অথচ তারা কোনোদিনও সূরা তাওবায় 'তোমরা মুশরিকদের যেখানেও পাও হত্যা করো' এটাকে সূরা মায়েদার 'যে নিরাপরাধ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করল, সে যেন পুরো মানবজাতিকেই হত্যা করল' এটার সাথে কন্ট্রাডিক্টরি বলতে দেখি না।

'অথচ সেভাবে ভাবলে, এই দুই আয়াতে দুরকম কথা বলা হচ্ছে। একবার মেরে ফেলতে বলছে, আরেকবার বলছে, মারলে পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার মতো চরম পাপ হবে। কিন্তু তবুও নাস্তিকরা এই দুটোকে এক পাল্লায় এনে কথা বলে না। কেন বলে না? কারণ তারাও জানে দুটো আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দুটোকে এক করে বলতে গেলেই নাস্তিকরা ধরা পড়বে, তাই বলে না।'

নিলুদা সব শুনলেন। শুনে বললেন–'এর জন্যই বুঝি মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে এসেছিলি?'

–'না দাদা, শুধু ডাবল স্ট্যান্ডবাজিটা উপলব্ধি করাতে এসেছি। হা হা হা।'

স্রেফ ভালো সম্পর্ক বলেই নিলুদা সেদিন রাগ করেননি হয়তো।

# স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল?

ল্যাম্পপোস্টের অস্পষ্ট আলোয় একজন বয়স্ক লোকের ছায়ামূর্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। গায়ে মোটা একটি শাল জড়ানো। পৌষের শীত। লোকটা হালকা কাঁপছেও।

আমরা খুলনা থেকে ফিরছিলাম। আমি আর সাজিদ। স্টেশন মাস্টারের রুমের পাশের একটি বেঞ্চিতে লোকটা আঁটসাঁট হয়ে বসে আছে। স্টেশনে এরকম কত লোকই তো বসে থাকে। তাই সেদিকে আমার বিশেষ কোনো কৌতূহল ছিল না। কিন্তু সাজিদকে দেখলাম সেদিকে এগিয়ে গেল।

লোকটার কাছে গিয়েই সাজিদ ধপাস করে বসে পড়ল। আমি দূর থেকে খেয়াল করলাম, লোকটার সাথে সাজিদ হেসে হেসে কথাও বলছে।

আশ্চর্য! খুলনার স্টেশন। এখানে সাজিদের পরিচিত লোক কোথা থেকে এল? তাছাড়া লোকটিকে দেখে বিশেষ কেউ বলেও মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোনো বাদাম বিক্রেতা। বাদাম বিক্রি শেষে প্রতিদিন ঐ জায়গায় বসেই হয়তো রাত কাটিয়ে দেয়।

আমাদের রাতের ট্রেন। এখন বাজে রাত দুটো। এই সময়ে সাজিদের সাথে কারও দেখা করার কথা থাকলে তা তো আমি জানতামই। অদ্ভুত!

আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম। একটু অগ্রসর হতেই দেখলাম, ভদ্রলোকের হাতে একটি বইও আছে। দূর থেকে আমি বুঝতে পারিনি। সাজিদ আমাকে ইশারা দিয়ে ডাকল। গেলাম।

লোকটার চেহারাটা বেশ চেনাচেনা লাগছে, কিন্তু সঠিক মনে করতে পারছি না।

সাজিদ বলল–'এইখানে বস। ইনি হচ্ছেন হুমায়ুন স্যার।'

হুমায়ুন স্যার? এই নামের কোনো স্যারকে তো আমি চিনি না। সাজিদকে জিজ্ঞেস করতে যাবো যে কোন হুমায়ুন স্যার, অমনি সাজিদ আবার বলল–'হুমায়ুন রুবায়েত আজাদকে চিনিস না? ইনি আর কি।'

এরপর সে লোকটার দিকে ফিরে বলল–'স্যার, এ হলো আমার বন্ধু, আরিফ।'

লোকটা আমার দিকে তাকাল না। সাজিদের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটে মৃদু হাসি।

আমার তখনো ঘোর কাটছেই না। কী হচ্ছে এসব? আমিও ধপাস করে সাজিদের পাশে বসে গেলাম।

সাজিদ আর হুমায়ুন রুবায়েত আজাদ নামের লোকটার মধ্যে আলাপ হচ্ছে। এমনভাবে কথা বলছে, যেন তারা পরস্পর পরস্পরকে অনেক আগে থেকেই চেনে।

লোকটা সাজিদকে বলছে–'তোকে কত করে বলেছি, আমার লেখা 'আমার অবিশ্বাস' বইটা ভালোমতো পড়তে। পড়েছিলি?'

সাজিদ বলল–'হ্যাঁ স্যার। পড়েছি তো।'

–'তাহলে আবার আস্তিক হয়ে গেলি কেন? নিশ্চয় কোনো ত্যাঁদড়ের ফাঁদে পড়েছিস? কে সে? নাম বল? পেছনে যে আছে–কী জানি নাম?'

–'আরিফ...'

–'হ্যাঁ, এই ত্যাঁদড়ের ফাঁদে পড়েছিস বুঝি? দাঁড়া, তাকে আমি মজা দেখাচ্ছি...'

এই বলে লোকটা বসা থেকে উঠতে গেল।

সাজিদ জোরে বলে উঠল–'না না স্যার। ও কিচ্ছু জানে না।'

–'তাহলে?'

–'আসলে স্যার, বলতে সংকোচ বোধ করলেও সত্য এটাই যে, নাস্তিকতার উপর আপনি যেসব লজিক দেখিয়েছেন, সেগুলো এতটাই দুর্বল যে, নাস্তিকতার উপর আমি বেশি দিন ঈমান রাখতে পারিনি।'

এটুকু বলে সাজিদ মাথা নিচু করে ফেলল।

লোকটার চেহারাটা মুহূর্তেই রুক্ষ ভাব ধারণ করল। বলল–'তার মানে বলতে চাইছিস, তুই এখন আমার চেয়েও বড় পণ্ডিত হয়ে গেছিস? আমার চেয়েও বেশি পড়ে ফেলেছিস? বেশি বুঝে ফেলেছিস?'

সাজিদ তখনও মাথা নিচু করে আছে।

লোকটা বলল–'যাক গে! একটা সিগারেট খাবো। ম্যাচ নেই। তোর কাছে আছে?'

–'জ্বি স্যার।', এই বলে সাজিদ ব্যাগ খুলে একটি ম্যাচ বের করে লোকটার হাতে দিল। সাজিদ সিগারেট খায় না। তবে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তার ব্যাগে থাকে সবসময়।

লোকটা সিগারেট ধরাল। কয়েকটা জোরে জোরে টান দিয়ে ফুঁস করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। ধোঁয়াগুলো মুহূর্তেই কুণ্ডুলি আকারে স্টেশন মাস্টারের ঘরের রেলিং বেয়ে উঠে যেতে লাগল। আমি সেদিকে তাকিয়ে আছি।

লোকটার কাশি উঠে গেল। কাশতে কাশতে লোকটা বসা থাকে উঠে পড়ল। এই মুহূর্তে উনার সিগারেট খাওয়ার আর ইচ্ছে নেই সম্ভবত। লোকটা সিগারেটের

টুকরোটিকে নিচে ফেলে পা দিয়ে একটি ঘষা দিল। অমনি সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটি থেঁতলে গেল।

সাজিদের দিকে ফিরে লোকটা বলল–'তাহলে এখন বিশ্বাস করিস যে স্রষ্টা বলে কেউ আছে?'

সাজিদ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

–'স্রষ্টা এই বিশ্বলোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন বলে বিশ্বাস করিস তো?'

আবারও সাজিদ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

এবার লোকটা একটা অদ্ভুত রকম হাসি দিল। এই হাসি এতটাই বিদঘুটে ছিল যে, তাতে আমার গা ছমছম করে উঠল।

লোকটি বলল–'তাহলে বল দেখি, স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল?'

এই প্রশ্নটি করে লোকটি আবার সেই বিদঘুটে হাসিটা হাসল।

সাজিদ বলল–'স্যার, বাই ডেফিনিশন, স্রষ্টার কোনো সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে না। যদি বলি 'ক' সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করেছে, তৎক্ষণাৎ আবার প্রশ্ন উঠবে, তাহলে 'ক' এর সৃষ্টিকর্তা কে? তখন যদি বলি 'ক' এর সৃষ্টিকর্তা 'খ', তাহলে আবার প্রশ্ন উঠবে 'খ' এর সৃষ্টিকর্তা কে? এভাবে চলতেই থাকবে। কোনো সমাধানে যাওয়া যাবে না।'

লোকটি বলল–'সমাধান আছে।'

–'কী সেটা?'

–'মেনে নেওয়া যে, স্রষ্টা নাই, ব্যস!', এটুকু বলে লোকটি আবার হাসি দিল। হা হা হা হা।

সাজিদ আপত্তি জানাল। বলল–'আপনি ভুল, স্যার।'

লোকটি চোখ কপালে তুলে বলল–'কী? আমি? আমি ভুল?'

–'জ্বি স্যার।'

–'তাহলে বল দেখি, স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল? উত্তর দে। দেখি কত বড় জ্ঞানের জাহাজ হয়েছিস তুই।'

আমি বুঝতে পারলাম এই লোক সাজিদকে যুক্তির গ্যাঁড়াকলে ফেলার চেষ্টা করছে।

সাজিদ বলল–স্যার, গত শতাব্দীতেও বিজ্ঞানীরা ভাবতেন, এই মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে আছে। মানে এটার কোনো শুরু নেই। তারা আরও ভাবত, এটার কোনো

শেষও নেই। তাই তারা বলতঃ যেহেতু এটার শুরু-শেষ কিছুই নেই, সুতরাং, এটার জন্য একটা সৃষ্টিকর্তারও দরকার নেই। কিন্তু থার্মোডাইনামিক্সের তাপ ও গতির সূত্রগুলো আবিষ্কার হওয়ার পর এই ধারণা পুরোপুরি ভ্যানিশ তো হয়ই, সাথে পদার্থবিজ্ঞানেও ঘটে যায় একটা বিপ্লব। থার্মোডাইনামিক্সের তাপ ও গতির দ্বিতীয় সূত্র বলছে–এই মহাবিশ্ব ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ অস্তিত্ব থেকে পর্যায়ক্রমে উত্তাপহীন অস্তিত্বের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সূত্রকে উল্টো থেকে প্রয়োগ কখনোই সম্ভব নয়। অর্থাৎ কম উত্তাপ অস্তিত্ব থেকে এটাকে বেশি উত্তাপ অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। এই ধারণা থেকে প্রমাণ হয়, মহাবিশ্ব চিরন্তন নয়। এটা অনন্তকাল ধরে এভাবে নেই। এটার একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে। থার্মোডাইনামিক্সের সূত্র আরও বলে, এভাবে চলতে চলতে একসময় মহাবিশ্বের সকল শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে।'

লোকটি বলল–'উফ! আসছেন বৈজ্ঞানিক লম্পু। সহজ করে বল ব্যাটা।'

সাজিদ বলল–'স্যার, একটা গরম কফির কাপ টেবিলে রাখা হলে, সেটা সময়ের সাথে আস্তে আস্তে তাপ হারাতে হারাতে ঠাণ্ডা হতেই থাকবে। কিন্তু সেটা টেবিলে রাখার পর যে-পরিমাণ গরম ছিল, সময়ের সাথে সাথে সেটা আরও বেশি গরম হয়ে উঠবে–এটা অসম্ভব। এটা কেবল ঠাণ্ডাই হতে থাকবে। একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যাবে, কফির কাপটা সমস্ত তাপ হারিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্সের সূত্র।'

–'হুম, তো?'

–'এর থেকে প্রমাণ হয়, মহাবিশ্বের একটা শুরু আছে। মহাবিশ্বের যে একটা শুরু আছে–তারও প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের উপর এ যাবৎ যতগুলো থিওরি বিজ্ঞানীমহলে এসেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, প্রমাণের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী থিওরি হলো–বিগ ব্যাং থিওরি। বিগ ব্যাং থিওরি বলছেঃ 'মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে একটি বিস্ফোরণের ফলে। তাহলে স্যার, এটা এখন নিশ্চিত যে, মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে।'

লোকটা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

সাজিদ আবার বলতে শুরু করল–'স্যার, আমরা সহজ সমীকরণ পদ্ধতিতে দেখব স্রষ্টাকে সৃষ্টির প্রয়োজন আছে কিনা, মানে স্রষ্টার সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে কিনা।

'সকল সৃষ্টির একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে এবং শেষ আছে; ধরি, এটা সমীকরণ ১।

'মহাবিশ্ব একটি সৃষ্টি; এটা সমীকরণ ২।

'এখন সমীকরণ ১ আর ২ থেকে পাই–

'সকল সৃষ্টির শুরু এবং শেষ আছে। মহাবিশ্ব একটি সৃষ্টি, তাই এটারও একটা শুরু এবং শেষ আছে।

'তাহলে, আমরা দেখলামঃ 'উপরের দুটি শর্ত পরস্পর মিলে গেল এবং তাতে থার্মোডাইনামিক্সের তাপ ও গতির সূত্রের কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি।'

–'হুঁ'

–'আমার তৃতীয় সমীকরণ হচ্ছেঃ 'স্রষ্টা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।'

'তাহলে খেয়াল করুন, আমার প্রথম শর্তের সাথে কিন্তু তৃতীয় শর্ত ম্যাচ হচ্ছে না।

'আমার প্রথম শর্ত ছিল: সকল সৃষ্টির শুরু আর শেষ আছে। কিন্তু তৃতীয় শর্তে কথা বলছি স্রষ্টা নিয়ে। তিনি সৃষ্টি নন, তিনি স্রষ্টা। তাই এখানে প্রথম শর্ত খাটে না। সাথে, তাপ ও গতির সূত্রটিও এখানে আর খাটছে না। তার মানে, স্রষ্টার শুরুও নেই, শেষও নেই। অর্থাৎ, তাকে নতুন করে সৃষ্টিরও প্রয়োজন নেই। তার মানে স্রষ্টার আরেকজন স্রষ্টা থাকারও প্রয়োজন নেই। তিনি অনাদি, অনন্ত।'

এতটুকু বলে সাজিদ থামল। হুমায়ুন আজাদ নামের লোকটি কপালের ভাঁজ দীর্ঘ করে বললেন–'কী ভংচং বুঝালি এগুলো? কীসব সমীকরণ-টমীকরণ? এসব কি? সোজা সাপ্টা বল। আমাকে অঙ্ক শিখাচ্ছিস? Laws of Causality সম্পর্কে ধারণা আছে? Laws of Causality মতে, সবকিছুর পেছনে একটা Cause বা কারণ থাকে। সেই সূত্র মতে, স্রষ্টার পেছনেও একটা কারণ থাকতে হবে।'

সাজিদ বলল–'স্যার, উত্তেজিত হবেন না প্লিজ। আমি আপনাকে অঙ্ক শিখাতে যাব কোন সাহসে? আমি শুধু আমার মতো ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছি।'

–'কচু করেছিস তুই। Laws Of Causality দিয়ে ব্যাখ্যা কর।', লোকটা উচ্চস্বরে বলল।

–'স্যার, Laws Of Causality বলবৎ হয় তখনই, যখন থেকে Time, Space এবং Matter জন্ম লাভ করে, ঠিক না? কারণ আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটিও স্বীকার করে যেঃ Time জিনিসটা নিজেই Space আর Matter-এর সাথে কানেক্টেড। Cause-এর ধারণা তখনই আসবে, যখন Time, Space, Matter এই ব্যাপারগুলো তৈরি হবে। তাহলে যিনিই এই Time, Space, Matter-এর স্রষ্টা, তাকে কী করে আমরা Time-Space-Matter-এর বাটখারাতে বসিয়ে Laws Of Causality দিয়ে বিচার করব, স্যার? এটা তো লজিকবিরুদ্ধ, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ।'

লোকটা চুপ করে আছে। কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিল। এর মধ্যেই আবার সাজিদ বলল–'স্যার, আপনি Laws Of Causality এর যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটা ভুল।'

লোকটা আবার রেগে গেল। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল–'এই ছোকড়া! আমি ভুল বলেছি মানে কী? তুই কি বলতে চাস আমি বিজ্ঞান বুঝি না?'

সাজিদ বলল–'না না স্যার, একদম তা বলিনি। আমার ভুল হয়েছে। আসলে, বলা উচিত ছিল যে, Laws Of Causality-এর সংজ্ঞা বলতে গিয়ে আপনি ছোট্ট একটা জিনিস মিস করেছেন।'

লোকটার চেহারা এবার একটু স্বাভাবিক হলো। বলল–'কী মিস করেছি?'

–'আপনি বলেছেন, Laws Of Causality মতে, সবকিছুরই একটি Cause থাকে। আসলে এটা স্যার সেরকম নয়। Laws Of Causality হচ্ছে: Everything which has a beginning has a cause; অর্থাৎ, এমন সবকিছু, যেগুলোর একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে, কেবল তাদেরই Cause থাকে। স্রষ্টার কোনো শুরু নেই, তাই স্রষ্টাকে Laws Of Causality দিয়ে মাপাটা যুক্তি এবং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ।'

লোকটার মুখ কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল–'তুই কি ভেবেছিস, এরকম ভারী ভারী কিছু শব্দ ব্যবহার করে কথা বললেই আমি তোর যুক্তি মেনে নেব? অসম্ভব।'

সাজিদ এবার মুচকি হাসল। হেসে বলল–'স্যার, আপনার হাতে একটি বই দেখছি। ওটা কী বই?'

–'এটা আমার লেখা বই: 'আমার অবিশ্বাস'।'

–'স্যার, ওটা আমাকে দেবেন একটু?'

–'এই নে, ধর।'

সাজিদ বইটা হাতে নিয়ে উল্টাল। উল্টাতে উল্টাতে বলল–'স্যার, এই বইয়ের কোন লাইনে আপনি আছেন?'

লোকটা ভ্রু কুঁচকে বলল–'মানে?'

–'বলছি, এই বইয়ের কোন অধ্যায়ের, কোন পৃষ্ঠায়, কোন লাইনে আপনি আছেন?'

–'তুই অদ্ভুত কথা বলছিস। আমি বইয়ে থাকব কেন?'

–'কেনো থাকবেন না? আপনি এর স্রষ্টা না?'

–'হ্যাঁ।'

–'এই বইটা কালি আর কাগজ দিয়ে তৈরি। আপনিও কি কালি আর কাগজ দিয়ে তৈরি স্যার?'

-খুবই স্টুপিডিটি টাইপ প্রশ্ন। আমি এই বইয়ের স্রষ্টা। এই বই তৈরির সংজ্ঞা দিয়ে কী আমাকে ব্যাখ্যা করা যাবে?'

সাজিদ আবার হেসে দিল। বলল-'না স্যার। এই বই তৈরির যে-সংজ্ঞা, সে-সংজ্ঞা দিয়ে মোটেও আপনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ঠিক সেভাবে, এই মহাবিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁকেও তাঁর সৃষ্টির Time-Space-Matter-Cause এসব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

'আপনি কালি, কলম বা কাগজের তৈরি নন, তার উর্ধ্বে। কিন্তু আপনি Time-Space-Matter-Cause-এর উর্ধ্বে নন। আপনাকে এগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করাই যায়। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন এমন একজন, যিনি নিজেই Time-Space-Matter-Cause-এর সৃষ্টিকর্তা। তাই তাঁকে Time-Space-Matter-Cause দিয়ে পরিমাপ করা যাবে না। অর্থাৎ তিনি এসবের উর্ধ্বে। অর্থাৎ তার কোনো Time-Space-Matter-Cause নেই। অর্থাৎ তার কোনো শুরু-শেষ নেই। অর্থাৎ তার কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই।'

লোকটা উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল-'ভালো ব্রেইনওয়াশড! ভালো ব্রেইনওয়াশড! আমরা কি এই তরুণ প্রজন্ম চেয়েছিলাম? হায়! আমরা কি এই তরুণ প্রজন্ম চেয়েছিলাম?'

এটা বলতে বলতে লোকটা হাঁটা ধরল। দেখতে দেখতেই উনি স্টেশনে মানুষের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পর আমি কিছুক্ষণ ঝিম মেরে ছিলাম। ঘড়িতে সময় দেখলাম-রাত দেড়টা বাজে। সাজিদের বিছানার দিকে তাকালাম। দেখলাম, সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। আমি উঠে তার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সে যে বইটা পড়ছে, সেটার নাম-'আমার অবিশ্বাস'। বইয়ের লেখক-হুমায়ুন আজাদ।

সাজিদ বই থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তার ঠোঁটের কোণায় একটি অদ্ভুত হাসি।

আমি বিরাট একটা শক খেলাম। নাহ! এটা হতে পারে না। স্বপ্নের উপর কারও হাত নেই; আমি বিড়বিড় করে বলতে লাগলাম।

# একটি সাম্প্রদায়িক আয়াত এবং...

সেদিন শাহবাগ মোড়ে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। আমি, সাজিদ, রূপম, মিলু, তারেক, শাহরিয়ার আর মিশকাত।

সকলেই জানেন, আমাদের মধ্যে সাজিদ হলো এক্স-এথেইস্ট। আগে নাস্তিক ছিল, এখন আস্তিক। রূপম আর শাহরিয়ার এখনো নাস্তিক। মার্কস-ই হলো তাদের ধ্যান-জ্ঞান। মিলু অ্যাগনোস্টিক। স্রষ্টা কি সত্যিই আছে, নাকি আদৌ নেই–সেই ব্যাপারে কোনো সমাধানে মিলু এখনো আসতে পারেনি। তারেক, মিশকাত আর আমি, আমরা মোটামোটি কোনো দিকে যাইনি এখনো।

সপ্তাহের প্রতি রোববারে আমরা এখানে আড্ডা দিই। আড্ডা না বলে এটাকে 'পাঠচক্র' বলাই যুতসই। সপ্তাহান্তে এখানে এসে পুরো এক সপ্তাহে কে কী পড়েছি, পড়ে কী বুঝেছি, কী বুঝিনি এসব আলোচনা করি। ভারী ইংরেজিতে যেটাকে 'বুক রিভিউ' বলা হয় আর কি!

আজকের আলোচক দুজনঃ শাহরিয়ার আর সাজিদ। শাহরিয়ার আলোচনা করবে প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর উপর, আর সাজিদ আলোচনা করবে আল-কোরআনের উপর।

দুজনই তুখোড় আলোচক। 'রিপাবলিক' নিয়ে শাহরিয়ারের আলোচনা বেশ জম্পেশ ছিল। রিপাবলিকে প্লেটো নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, শিষ্টাচার, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের গঠন, উপাদান, পরিবার, নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব, সমাজে নারী–পুরুষের মূল্যায়ন ইত্যাদির উপর যে-সবিস্তার আলোচনা করেছিলেন, শাহরিয়ার খুবই চমৎকারভাবে তার সারসংক্ষেপ আমাদের সামনে তুলে ধরল। মনে হচ্ছিলঃ খোদ প্লেটোই যেন আমাদের সামনে আঙুল উঁচিয়ে উঁচিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোন জিনিসটার কী ব্যাখ্যা, কী কাজ, কী ধর্ম।

শাহরিয়ারের আলোচনা শেষ হলে সাজিদ তার আলোচনা শুরু করে। সেও আল-কোরআন নাজিল হওয়ার কারণ, এতে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, নারী-পুরুষ এবং এতদসংক্রান্ত যে-বিষয়গুলো আছে–তার একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরল। আলোচনা শেষ করার আগে সাজিদ এই বলে শেষ করল যেঃ 'আল-কোরআন নাজিল হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। এটি শুধু মুসলিমদের জন্য নয়। আমাদের সুশীল পরিভাষায় যেটাকে অসাম্প্রদায়িক বলে আর কি।', এতটুকু বলে সাজিদ থামল।

দুজনের আলোচনাই বেশ প্রফুল্ল ছিল। কিন্তু গণ্ডগোল পাকাল রূপম। সাজিদ আল-কোরআনকে অসাম্প্রদায়িক বই বলেছে–এটা সে মেনে নিতে পারেনি।

বলে নিই, রূপম সাজিদের ক্লাসমেট। তাই দুজনের মধ্যকার সম্পর্কটি আমি-তুমি বা আপনি নয়; তুই-তুকারির সম্পর্ক।

রূপম খুবই অবজ্ঞার সুরে সাজিদকে উদ্দেশ্য করে বলল–'কোরআন অসাম্প্রদায়িক, এটাও আমাকে শুনতে হলো, হা হা হা হা।'

সাজিদ বলল–'হ্যাঁ। অবশ্যই।'

এরপর রূপম বলল–'কোরআনের সাম্প্রদায়িক আয়াত মনে হয় তুই এখনো পড়িসনি। তাই জানিস না।'

–'আমি না পড়ে থাকলে তুই পড়ে আমাকে শোনা', সাজিদ বলল।

রূপম ইংরেজিতে সূরা আলে-ইমরানের ১১৮ নং আর আল মায়েদার ৫১ নং আয়াতটি পড়ে শোনাল। সাথে অনুবাদ করেও পড়ল। সে বলল–

'O you, who believe! do not take for intimate friends from among others than your own people'

অর্থ: 'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না।'

দেখ! কোরআনই তোদের বলছে, আমাদের, মানে অমুসলিমদের বন্ধুরূপে না নিতে। আর তুই কিনা এখানে কোরআনকে অসাম্প্রদায়িকতার সার্টিফিকেট দিচ্ছিস। হাস্যকর না? এটা অসাম্প্রদায়িকতার নতুন সংজ্ঞা বুঝি? অমুসলিমদের বন্ধু বানাবা না, খবরদার! –হা হা হা।'

আমি একটু চিন্তায় পড়লাম। অবজ্ঞার সুরে বললেও রূপমের কথা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। অপেক্ষা করছি সাজিদের উত্তরের জন্য।

সাজিদ একটু ঝেড়ে কেশে নিল। এরপর বলতে শুরু করল–

'দেখ রূপম! কোরআন নাজিল হয়েছে হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর। এখন কোরআনের আয়াতগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝিয়েছেন। প্লেটোর রিপাবলিক তুই তোর মনমতো ব্যাখ্যা করতে পারিস না বা বুঝে নিতে পারিস না। তোকে ঠিক সেভাবেই বুঝতে হবে, যেভাবে প্লেটো বুঝিয়েছেন। এতটুকু তো কমন সেন্সের ব্যাপার, তাই না?'

রূপম বলল–'হুম।'

–'এখন কোরআনকেও আমরা সেভাবেই বুঝব, যেভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝিয়েছেন। প্রথমে তুই যে আয়াতের কথা বললি, সেই আয়াতে আসি। ঐ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বলেছেনঃ অমুসলিমদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতে। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা 'বন্ধু' শব্দটার জন্য যে-অ্যারাবিক ওয়ার্ডটি ব্যবহার করেছেন, তা হলো 'আউলিয়া'। রাইট?'

রূপম বলল–'হতে পারে। আমি আরবি বুঝি না।'

রূপমের আরবি বোঝার কথাও না। সে হিন্দু ফ্যামিলি থেকে উঠে আসা। ব্লগে মুক্তমনা নামধারী নাস্তিকদের লেখালেখি পড়ে কোরআন নিয়ে যা একটু জানে। সাজিদ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল–'আরিফ, মোবাইল খুলে কোরআনের অ্যাপস থেকে আয়াতটি তিলাওয়াত করে শোনা।'

আমি শুনালাম। রূপম বিশ্বাস করল যে, সেই আয়াতে 'বন্ধু' শব্দের জন্য আরবি 'আউলিয়া' শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।

সাজিদ বলল–'শুনলি?'

–'হ্যাঁ।'

–'এখন, আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করব। অ্যারাবিকে 'আউলিয়া' শব্দটির জন্য দুটি অর্থ করা যায়। একঃ বন্ধু, দুইঃ অভিভাবক। আমরা এখানে সেই অর্থটা নেব, যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণ হয়ে আসবে।

'তার আগে দুটি বিষয় ক্লিয়ার করি। 'আউলিয়া' শব্দের জন্য 'বন্ধু' আর 'অভিভাবক' দুই অর্থ করা গেলেও এই দুই শব্দের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বন্ধু মানে বন্ধু। এই যেমন, তুই আমার বন্ধু। আমি তোর সাথে এখানে বসে আড্ডা দিচ্ছি, খাচ্ছি। অনেক রাত একসাথে ঘুমিয়েছি। ক্লাস করি একসাথে। আবার আমার বাবা-মা'ও আমার বন্ধু। কিন্তু, তুই আর আমার বাবা-মা কি একই রকম বন্ধু? নাহ। পার্থক্য আছে। তারা আমার অভিভাবক, বন্ধু। তোর সাথে বন্ধুত্বের যে-ডেফিনিশন, তাদের সাথে সামথিং মোর দ্যান দ্যাট, রাইট?'

রূপম মাথা নাড়ল।

সাজিদ আবার বলতে লাগল–

'আমার বাবা-মা আমার যাবতীয় সিক্রেট জানে। আমার দুর্বলতা কোথায় জানে। তুই জানিস?'

–'নাহ।'

–'এবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনীতে যা, তুই সেখানে দেখবিঃ তিনি অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন। অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। তাদের সাথে খেয়েছেন, কাজ করেছেন, কত কি। মানে এখন আমি যা যা তোর সাথে করি, অনেকটা সে-রকম। তাই না?'

আমাদের সবাই মাথা নাড়লাম। রূপমও মাথা নাড়ল।

–'তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঐ আয়াতে 'আউলিয়া' অর্থে আমরা 'বন্ধু' শব্দটা নিতে পারব না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যদি 'আউলিয়া' শব্দটি দ্বারা 'বন্ধু'ই বোঝাতেন, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই অমুসলিমদের সাথে ওঠা-বসা করতেন না। তাহলে প্রশ্ন এখানে, 'আউলিয়া' শব্দের কোন অর্থ বোঝানো হয়েছে? হ্যাঁ, এখানে 'আউলিয়া' শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে অভিভাবক। আল্লাহ্ আমাদের বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা অমুসলিমদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ কোরো না।'

একজন অভিভাবক হলো সে-ই, যে আমাদের যাবতীয় গোপন খবর জানবে, আমাদের শক্তি, আমাদের কৌশল, আমাদের দুর্বলতা জানবে। এখন আল্লাহ্ বলেছেন, অমুসলিমদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ কোরো না। মানে, অমুসলিমদের কাছে তোমরা তোমাদের সিক্রেট বলে দিয়ো না। কারণ এতে কোনো এক সময় হিতে বিপরীত হতে পারে। বিপদ হতে পারে।

–'কী রকম বিপদ?', তারেক জিজ্ঞেস করল।

সাজিদ বলল–'যেমন, ইসলামের প্রথম জিহাদ কোনটি? বদর যুদ্ধ, তাই না?'

–'হ্যাঁ।', আমি বললাম।

–'সেই যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল? মাত্র ৩১৩ জন। আর প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার, তাই তো?'

–'হু।'

–'আর, সেই যুদ্ধের আগে মুসলিমরা যদি অমুসলিমদের কাছে গিয়ে বলতঃ জানো, আমরা না মাত্র ৩১৩ জন নিয়ে তোমাদের সাথে লড়ব। এটা কি ঠিক হতো? নাহ, হতো না। এই তথ্য ফাঁস হলে কি হতো? প্রতিপক্ষের মনে সাহস বেড়ে যেত। তারা যুদ্ধে শারীরিকভাবে জেতার আগেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে জিতে যেত। এটা কি শুভ হতো? আজকের দিনে কোনো দেশ কি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে? আমেরিকা কি তার সামরিক শক্তির কথা চীন বা রাশিয়ার কাছে শেয়ার করে? করে না। ঠিক একইভাবে আল্লাহ্ও বলছেনঃ 'ওদের তোমরা অভিভাবক হিসেবে নিও না।'

'এটা একটা সেইফটি। এখানে বন্ধু বানাতে নিষেধ করেনি, অভিভাবক বানাতে নিষেধ করেছে।'

আমরা চুপ করে আছি। রূপমও কিছু বলছে না।

এবার সাজিদ বলল—'রূপম, ফার্স্ট ইয়ার থেকেই আমি তোর বন্ধু। আমাদের বন্ধুত্বের আজকে চার বছর চলছে। এই চার বছরের বন্ধুত্বে তুই কোনোদিন আমাকে তোর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়েছিস? হা হা হা। দিসনি। তোর ক্রেডিট কার্ডের গোপন নাম্বার কোনো দিন আমায় বলেছিস? বলিসনি। এমনকি কোনো দিন তোর ফেসবুক পাসওয়ার্ডটিও তো দিলিনা! হা হা হা। কেন দিলি না? কারণ আমি তোর বন্ধু, তোর অভিভাবক না।

'এখন কি আমি তোকে বলতে পারিঃ রূপম, তুই ব্যাটা আস্ত একটা সাম্প্রদায়িক ফ্রেন্ড, বলতে পারি? হা হা হা।'

সাজিদ রূপমের মুখের দিকে চেয়ে আছে কোনো একটি উত্তরের আশায়। রূপম কিছু না বলে ফিক করে হেসে দিল। মনে হচ্ছে সাজিদের কথায় সে খুব মজা পেয়েছে।

## কোরআন কি সূর্যকে পানির নিচে ডুবে যাওয়ার কথা বলে?

সাজিদের খুব মন খারাপ। আমি রুমে ঢুকে দেখলাম সে তার খাটের উপর শক্ত মুখ করে বসে আছে। আমি বললাম, 'ক্লাস থেকে কখন এলি? সে কোনো উত্তর দিল না। আমি কাঁধ থেকে সাড়ে দশ কেজি ওজনের ব্যাগটি নামিয়ে রাখলাম টেবিলের উপর। তার দিকে ফিরে বললাম, কী হয়েছে রে? মুখের অবস্থা নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটনের মতো করে রেখেছিস।'

সে বলল–'ট্রাইটন দেখতে কী রকম?'

–'আমি শুনেছি ট্রাইটন দেখতে নাকি বাংলা পাঁচের মতো।'

আমি জানি, সাজিদ এক্ষুণি একটা ছোটখাটো লেকচার শুরু করবে। সে আমাকে ট্রাইটনের অবস্থান, আকার-আকৃতি, ট্রাইটনের ভূ-পৃষ্ঠে নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ, সূর্য আর নেপচুন থেকে ট্রাইটনের দূরত্ব কত–তার যথাযথ বিবরণ এবং তথ্যাদি দিয়ে প্রমাণ করে দেখাবে যে, ট্রাইটন দেখতে মোটেও বাংলা পাঁচের মতো নয়।

এই মুহূর্তে তার লেকচার বা বকবকানি, কোনোটাই শোনার ইচ্ছে আমার নেই। তাই, যে করেই হোক, তাকে দ্রুত থামিয়ে দিতে হবে। আমি আবার বললাম, 'ক্লাসে গিয়েছিলি?'

–'হুঁ'

–'কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি? মন খারাপ?'

সে আবার চুপ মেরে গেল। এই হলো একটা সমস্যা। সাজিদ যেটা বলতে চাইবে না, পৃথিবী যদি ওলটপালট হয়েও যায়, তবু সে মুখ খুলে সেটা কাউকে বলবে না।

সে বলল–'কিচেনে যা। ভাত বসিয়েছি। দেখে আয় কী অবস্থা।'

আমি আকাশ থেকে পড়ার মতো করে বললাম–'ভাত বসিয়েছিস মানে? বুয়া আসেনি?'

–'না।'

–'কেন?'

–'অসুস্থ বলল।'

–'তাহলে আজ খাব কি?'

সাজিদ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সেদিকে তাকিয়ে বলল–'ভাত বসিয়েছি। কলে যথেষ্ট পরিমাণে পানি আছে। পানি দিয়ে ভাত গিলা হবে।'

সিরিয়াস সময়গুলোতেও তার এরকম রসিকতা আমার একেবারেই ভালো লাগে না।

অগত্যা কিচেনের দিকে হাঁটা ধরলাম। যেটা ভেবেছি ঠিক সেটা নয়। ভাত বসানোর পাশাপাশি সে ডিমও সিদ্ধ করে রেখেছে। আমার পেছনে পেছনে সাজিদও এল। এসে ভাত নামিয়ে কড়াইতে তেল, তেলে কিছু পেঁয়াজ কুঁচি, হালকা গুঁড়ো মরিচ, এক চিমটি নুন দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে, তাতে ডিম দুটো ছেড়ে দিল। পাশে আমি পর্যবেক্ষকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছি। মনে হচ্ছে, সাজিদ কোনো রান্নার প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী, আর আমি চিফ জাস্টিস। অল্প কিছুক্ষণ পরেই ডিম দুটোর বর্ণ লালচে হয়ে উঠল। মাছকে হালকা ভাজলে যেরকম দেখায়, সেরকম। সুন্দর একটি পোড়া গন্ধও বেরিয়েছে।

আমি মুচকি হেসে বললাম–'খামোখা বুয়া রেখে এতগুলো টাকা অপচয় করি প্রতিমাসে। অথচ ভুবন বিখ্যাত বুয়া আমার রুমেই আছে। হা হা হা।'

গোসল সেরে, নামাজ পড়ে, খেয়ে উঠলাম। রুটিন অনুযায়ী, সাজিদ এখন ঘুমোবে। রাতের যে-বাড়তি অংশ সে বই পড়ে কাটায়, সেটা দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেয়।

আমার আজকে কাজ নেই। চাইলেই ঘুরতে বেরোতে পারি। কিন্তু বাইরে যা রোদ! সাহস হচ্ছিল না।

এরই মধ্যে সাজিদ ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটি কচকচানি রয়ে গেল। সাজিদকে এরকম মন খারাপ অবস্থায় আমি আগে কখনো দেখিনি। কেন তার মন খারাপ সে ব্যাপারে জানতে না পারলে শান্তি পাচ্ছি না। কিন্তু সাজিদকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। সে কোনো দিনও বলবে না। ভাবছি কী করা যায়।

তখন মনে পড়ল তার সেই বিখ্যাত (আমার মতে) ডায়েরিটার কথা, যেটাতে সে তার জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো হুবহু লিখে রাখে। আজকে তার মন খারাপের ব্যাপারটিও নিশ্চয় সে তুলে রেখেছে। তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে তার ডায়েরিটা নিয়ে উল্টাতে লাগলাম।

মাঝামাঝিতে এসে পেয়ে গেলাম মূল ঘটনাটা। যে রকম লেখা আছে, সেভাবেই তুলে ধরছি–

'পহেলা মে, ২০১৪-

মফিজুর রহমান স্যার। এই ভদ্রলোক ক্লাসে আমাকে উনার শত্রু মনে করেন। ঠিক শত্রু না, প্রতিদ্বন্দ্বী বলা যায়। আমাকে নিয়ে উনার সমস্যা হলোঃ উনি উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মনে ধর্ম, ধর্মীয় কিতাব, আল্লাহ, রাসূল ইত্যাদি নিয়ে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি প্রতিবারই উনার এমন কাজের প্রতিবাদ করি। উনার যুক্তির বিপরীতে যুক্তি দিই। এমনও হয়েছে, যুক্তিতে পরাজিত হয়ে উনি ক্লাস থেকেও চলে গিয়েছিলেন

কয়েকবার। এ কারণে এই বামপন্থি লোকটা আমাকে চক্ষুশূল মনে করেন। সে যাকগে! আজকের কথা বলি।

আজকে ক্লাসে এসেই ভদ্রলোক আমাকে খুঁজে বের করলেন। বুঝতে পেরেছি, নতুন কোনো উছিলা খুঁজে পেয়েছে আমাকে ঘায়েল করার। ক্লাসে আসার আগে মনে হয় পান খেয়েছিলেন। ঠোঁটের এক কোণায় চুন লেগে আছে। আমাকে দাঁড় করিয়ে বড় বড় চোখ করে বললেন–'বাবা আইনস্টাইন, কী খবর?'

ভদ্রলোক আমাকে তাচ্ছিল্য করে 'আইনস্টাইন' বলে ডাকেন। আমাকে আইনস্টাইন ডাকতে দেখে উনার অন্য শাগরেদগণ হাসাহাসি শুরু করল।

আমি কিছু না বলে চুপ করে আছি। তিনি আবার বললেন–'শোনো বাবা আইনস্টাইন, তুমি তো অনেক বিজ্ঞান জানো, বলো তো দেখি, সূর্য কি পানিতে ডুবে যায়?'

ক্লাস স্তিমিত হয়ে গেল। সবাই চুপচাপ।

আমি মাথা তুলে স্যারের দিকে তাকালাম। বললাম–'জ্বি না স্যার। সূর্য কখনোই পানিতে ডোবে না।'

স্যার অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন–'ডোবে না? ঠিক তো?'

–'জ্বি স্যার।'

–'তাহলে সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয় কেন হয় বাবা? বিজ্ঞান কী বলে?' আমি বললাম–'স্যার, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরে। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরার সময়, পৃথিবীর গোলার্ধের যে-অংশটা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, সে অংশে তখন সূর্যোদয় হয়; দিন থাকে। ঠিক একইভাবে, পৃথিবীর গোলার্ধের যে-অংশটা তখন সূর্যের বিপরীত দিকে মুখ করে থাকে, তাতে তখন সূর্যাস্ত হয়; রাত নামে। আদতে, সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয় বলে কিছু নেই। সূর্য অস্তও যায় না, উদিতও হয় না। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে আমাদের এমনটি মনে হয়।'

স্যার বললেন–'বাহ! সুন্দর ব্যাখ্যা।'

উনি আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন–'তা বাবা, এই ব্যাপারটার উপর তোমার আস্থা আছে তো? সূর্য পানিতে ডুবে যাওয়াতে বিশ্বাস করো কি?' পুরো ক্লাসে তখনও পিনপতন নীরবতা।

আমি বললাম–'না স্যার। সূর্যের ডুবে-টুবে যাওয়াতে আমি বিশ্বাস করি না।' এরপর স্যার বললেন–'বেশ! তাহলে ধরে নিলাম, আজ থেকে তুমি আর কোরআনে বিশ্বাস করো না।'

স্যারের কথা শুনে আমি খানিকটা অবাক হলাম। পুরো ক্লাসও সম্ভবত আমার মতোই হতবাক। স্যার মুচকি হেসে বললেন–'তোমাদের ধর্মীয় কিতাব, যেটাকে আবার 'বিজ্ঞানময়' বলে দাবি করো তোমরা, সেই কোরআনে আছে, সূর্য নাকি পানিতে ডুবে যায়। হা হা হা।'

আমি স্যারের মুখের দিকে চেয়ে আছি। স্যার বললেন–'কি বিশ্বাস হচ্ছে না তো? দাঁড়াও, পড়ে শোনাই।'

এতটুকু বলে স্যার কোরআনের সূরা কাহফের ৮৬ নাম্বার আয়াতটি পড়ে শোনালেন–
'(চলতে চলতে) এমনিভাবে তিনি (জুলকারনাঈন) সূর্যের অস্ত গমনের জায়গায় গিয়ে পৌঁছালেন, সেখানে গিয়ে তিনি সূর্যকে (সাগরের) কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখলেন। তার পাশে তিনি একটি জাতিকেও (বাস করতে) দেখলেন, আমি বললাম, হে জুলকারনাঈন! (এরা আপনার অধীনস্ত), আপনি ইচ্ছা করলে (তাদের) শাস্তি দিতে পারেন, অথবা তাদের আপনি সদয়ভাবেও গ্রহণ করতে পারেন।'

এরপর বললেন–'দেখো, তোমাদের 'বিজ্ঞানময়' ধর্মীয় কিতাব বলছে যে, সূর্য নাকি সাগরের কালো পানিতে ডুবে যায়। হা হা হা। বিজ্ঞানময় কিতাব বলে কথা!'

ক্লাসের মধ্যে যারা স্যারের মতোই নাস্তিক, তারা হো হো করে হেসে উঠল। আমি কিছুই বললাম না। চুপ করে ছিলাম।

এতটুকুই লেখা। আশ্চর্য! সাজিদ, মফিজুর রহমান নামের এই ভদ্রলোকের কথার কোনো প্রতিবাদ করল না? সে তো এরকম করে না সাধারণত। তাহলে কি...? আমার মনে নানা ধরনের প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল সেদিন।

এর চার মাস পরের কথা।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় সাজিদ আমাকে এসে বলল–'আগামীকাল ডিপার্টমেন্ট থেকে ট্যুরে যাচ্ছি। তুইও সাথে যাচ্ছিস।'

আমি বললাম–'আমি? পাগল নাকি? তোদের ডিপার্টমেন্ট ট্যুরে আমি কীভাবে যাব?'

–'সে ভাবনাটা আমার। তোকে যা বললাম, জাস্ট তা শুনে যা।'

পরদিন সকাল বেলা বের হলাম। তার ফ্রেন্ডদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। স্যারবৃন্দও আছেন। মফিজুর রহমান নামের ভদ্রলোকটির সাথেও দেখা হলো। বিরাট গোঁফওয়ালা। এই লোকের পূর্বপুরুষ সম্ভবত ব্রিটিশদের পিয়নের কাজ করত।

যাহোক, আমরা যাচ্ছি কুয়াকাটা। পৌঁছতে পাক্কা চার ঘণ্টা সময় লাগল। সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি করলাম। স্যারদের বেশ বন্ধুবৎসল মনে হলো।

ঘড়িতে সময় তখন পাঁচটা বেজে পঁচিশ মিনিট। আমরা সমুদ্রের কাছাকাছি হোটেলে আছি। আমাদের সাথে মফিজুর রহমান স্যারও আছেন। তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন-'গাইজ, বি রেডি! আমরা এখন কুয়াকাটার বিখ্যাত সূর্যাস্ত দেখব। তোমরা নিশ্চয় জানো, এটি দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র সমুদ্র সৈকত, যেখান থেকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়।'

আমরা সবাই প্রস্তুত ছিলাম আগে থেকেই। বেরুতে যাব, ঠিক তখনি সাজিদ বলে বসল-'স্যার, আপনি সূর্যাস্ত দেখবেন?'

স্যার বললেন-'Why not! How can I miss such an amazing moment?'

সাজিদ বলল—'স্যার, আপনি বিজ্ঞানের মানুষ হয়ে খুব অবৈজ্ঞানিক কথা বলছেন। এমন একটি জিনিস আপনি কী করে দেখবেন বলছেন, যেটা আদতে ঘটেই না।'

এবার আমরা সবাই অবাক হলাম। যে যার চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। সাজিদ দাঁড়িয়ে আছে।

স্যার কপালের ভাঁজ দীর্ঘ করে বললেন-'What do you want to mean?' সাজিদ হাসল। হেসে বলল-'স্যার, খুবই সোজা। আপনি বলছেন, আপনি আমাদের নিয়ে সূর্যাস্ত দেখবেন। কিন্তু স্যার দেখুন, বিজ্ঞান বুঝে এমন লোক মাত্রই জানে, সূর্য আসলে অস্ত যায় না। পৃথিবীর গোলার্ধের যে-অংশ সূর্যের গোলার্ধের বিপরীত মুখে অবস্থান করতে শুরু করে, সে-অংশটা আস্তে আস্তে অন্ধকারে ছেঁয়ে যায় কেবল। কিন্তু সূর্য তার কক্ষপথেই থাকে। ওঠেও না, ডোবেও না। তাহলে স্যার, সূর্যাস্ত কথাটা তো ভুল, তাই না?'

এবার আমি বুঝে গেছি আসল ব্যাপার। মজা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।

মফিজুর রহমান নামের লোকটা একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলল-'দেখো সাজিদ, সূর্য যে উদিত হয় না আর অস্ত যায় না, তা আমি জানি। কিন্তু, এখান থেকে দাঁড়ালে আমাদের কী মনে হয়? মনে হয়, সূর্যটা যেন আস্তে আস্তে পানির নিচে ডুবে যাচ্ছে। এটাই আমাদের চর্মচক্ষুর সাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। তাই আমরা এটাকে সিম্পলি, 'সূর্যাস্ত' নাম দিয়েছি। বলার সুবিধার জন্যও এটাকে 'সূর্যাস্ত' বলাটা যুক্তিযুক্ত। দেখো, যদি আমি বলতাম-'ছেলেরা, একটু পর পৃথিবীর গোলার্ধের যে-অংশে বাংলাদেশের অবস্থান, সে-অংশটা সূর্যের ঠিক বিপরীত দিকে মুখ নিতে চলেছে। তার মানে, এখানে এক্ষুণি আঁধার ঘনিয়ে সন্ধ্যা নামবে।

আমাদের সামনে সূর্যটা লুকিয়ে যাবে। চলো, আমরা সেই দৃশ্যটা অবলোকন করে আসি', আমি যদি এরকম বলতাম ব্যাপারটা ঠিক বিদঘুটে শোনাতো নিশ্চয়। ভাষা তার মাধুর্যতা হারাতো। শ্রুতি মধুরতা হারাতো। এখন আমি এক শব্দেই বুঝিয়ে দিতে পারছি আমি কী বলতে চাচ্ছি, সেটা।

সাজিদ মুচকি হাসল। সে বলল–'স্যার, আপনি একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। বিজ্ঞান পড়েন, বিজ্ঞান পড়ান। আপনি আপনার সাধারণ চর্মচক্ষু দিয়ে দেখতে পান যে, সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে পানির নিচে। এই ব্যাপারটাকে আপনি সুন্দর করে বুঝানোর জন্য 'সূর্যাস্ত' নাম দিতে পারেন। তাহলে সূরা কাহ্‌ফে জুলকারনাঈন নামের লোকটি এরকম একটি সাগর পারে এসে যখন দেখলঃ সূর্যটা পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে, সেই ঘটনাকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে সহজে বুঝানোর জন্য, সহজবোধ্য করার জন্য, ভাষার শ্রুতিমধুরতা ধরে রাখার জন্য, কুলি থেকে মজুর, মাঝি থেকে কাজি, ব্লগার থেকে বিজ্ঞানী, ডাক্তার থেকে ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র থেকে শিক্ষক, সবাইকে সহজে বোঝানোর জন্য যদি বলেন–

'(চলতে চলতে) এমনিভাবে তিনি (জুলকারনাঈন) যখন সূর্যের অস্ত গমনের জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলেন, সেখানে গিয়ে তিনি সূর্যকে (সাগরের) কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখলেন'।

'তখন কেন স্যার ব্যাপারটা অবৈজ্ঞানিক হবে? কোরআন বলে না যে, সূর্য পানির নিচে ডুবে গেছে। কোরআন এখানে ঠিক সেটাই বলেছে, যেটা জুলকারনাঈন দেখেছে এবং বুঝেছে। আপনি আমাদের সূর্যাস্ত দেখাবেন বলছেন মানে এই না যে, আপনি বলতে চাচ্ছেন সূর্যটা আসলেই ডুবে যায়। আপনি সেটাই বোঝাতে চাচ্ছেন, যেটা আমরা বাহ্যিকভাবে দেখি। তাহলে, একই ব্যাপার আপনি পারলে, কোরআন কেন পারবে না স্যার? আপনারা কথায় কথায় বলেন–'The sun rises in the east & sets in the west' এবং বলা হয়ে থাকে এগুলো ইউনিভার্সাল ট্রুথ। যেখানে সূর্যের সাথে ওঠা ও ডুবে যাওয়ার কোনো সম্পর্কই নাই, তখন কীভাবে এগুলো চিরন্তন সত্য হয় স্যার? এগুলো আপনাদের কাছে অবৈজ্ঞানিক নয়। আপনারা কথায় কথায় সূর্যোদয়, সুর্যাস্তের কথা বলেন। সেই কথা কেবল কোরআনুল কারীম বললেই চিৎকার করে বলে উঠেনঃ কোরআন অবৈজ্ঞানিক। কেন স্যার?

সাজিদ একনাগাড়ে এতসব কথা বলে গেল। স্যারের মুখ কিছুটা পানসে দেখা গেল। তিনি বললেন–'দীর্ঘ চারমাস ধরে এমন একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিলে তুমি?'

আমরা সবাই হেসে দিলাম। সাজিদও হাসল। বড় অদ্ভুত সে হাসি।

# মুসলমানদের কোরবানি ঈদ এবং একজন মাতুব্বরের অযাচিত মাতব্বরি

পদ্মার বুক চিরে আমাদের লঞ্চ চলছে।

দুপাশ থেকে শুনতে পাচ্ছি পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। সাধারণত, লঞ্চগুলোর মাথার উপর বিশাল সাইজের একটি ছাউনি থাকে। কিন্তু আমাদের লঞ্চটির উপরিভাগ খালি। কোনো ছাউনি নেই।

আকাশটা একদম উদোম। উপরে তারা-নক্ষত্র ভর্তি সুবিশাল আকাশ, নিচে আছে স্রোতস্বিনী পদ্মা।

চাঁদের প্রতিফলিত আলোতে নদীর পানি ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। সে এক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য!

আমরা যাচ্ছি রসুলপুর গ্রামে। বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রাম।

সাজিদের অনুরোধ, এবারের কোরবানির ঈদটা তার সাথে তাদের বাড়িতে করতে হবে। তাই যাওয়া। তাছাড়া, যখন শুনলাম পদ্মা-মেঘনার সঙ্গমস্থলের উপর দিয়ে যাওয়া হবে, তখন আর লোভ সামলানো গেল না। আমি এর আগে কখনো এই নদী দুটোকে স্বচক্ষে দেখিনি। তাই বিনা অজুহাতে তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম।

লঞ্চে আমরা তিনজন মাত্র মানুষ। আমি, সাজিদ এবং একজন লঞ্চ চালক। মধ্যবয়স্ক এই লোকটার নাম মহব্বত আলি। যারা নৌকা চালায় তাদের মাঝি বলা হয়। যারা জাহাজ চালায় তাদের বলে নাবিক। যারা লঞ্চ চালায় তাদের কী বলে? আমি জানি না।

মহব্বত আলি নামের এই লোক লঞ্চের এক মাথায় জড়োসড়ো হয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। মাঝিদের মতো তার বৈঠা চালানোর চিন্তা নেই। তেলের ইঞ্জিন।

আমি আর সাজিদ লঞ্চের একেবারে মাঝখানে বসে আছি। একটি চাদর পাতা হয়েছে। সাথে আছে পানির বোতল, চিনা বাদাম, ভাজা মুড়ি।

মাথার উপরে আকাশ।

হঠাৎ করে আমার তখন মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে গেল। আমি সাজিদকে প্রশ্ন করলাম–'তুই কি মানিকদার 'পদ্মা নদীর মাঝি' পড়েছিস?'

সাজিদ বলল–'হু।'

আমিও কতবার পড়েছি এই উপন্যাস। সব চরিত্রগুলোর নাম আমার ঠিক মনে নেই। তবে উপন্যাসের নায়কের বউটা ল্যাংড়া ছিল এবং নায়কের সাথে তার শ্যালিকার পরকীয়া প্রেম ছিল, এই ঘটনাগুলো আবছা আবছা মনে করতে পারি।

সাজিদ আমাকে বলল–'হঠাৎ উপন্যাসে চলে গেলি কেন?'

–'না, এমনি।'

এটুকু বলে দুজনে খানিক্ষণ চুপচাপ ছিলাম। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম–'আচ্ছা, ঐ উপন্যাসের কোন চরিত্রটি তোর কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লেগেছে?'

আমি ভাবলাম, সাজিদ হয় উপন্যাসের নায়ক কিংবা নায়কের শ্যালিকার কথাই বলবে। কিন্তু সাজিদ বলল–'ঐ উপন্যাসে ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার আছে কেবল একটিই। সেটি হলো হোসেন মিয়া।'

আমি খানিকটা অবাক হলাম। অবাক হলাম কারণ সাজিদ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এক সেকেন্ডও ভাবেনি। কত আগে পড়া একটি উপন্যাস থেকে সে এমন একটি ক্যারেক্টারের নাম বলেছে, যেটি উপন্যাসটির কোনো মূল চরিত্রের মধ্যেই পড়ে না। হোসেন মিয়া নামে এই উপন্যাসে কোনো চরিত্র আছে, সেটিই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম–'হোসেন মিয়া? নায়ক নয় কেন?'

সাজিদ বলল–'কুবের মাঝির মতো কত শত মাঝি পদ্মাপারে অহরহ দেখা যায়, যাদের ঘরে মালার মত একটি খোঁড়া পা-ওয়ালা, কিংবা অন্ধ স্ত্রী আছে, আছে তিন চারটে করে পেটুক সন্তান। আছে কপিলার মতো সুন্দরী শ্যালিকা। তাদের মাঝেও পরকীয়া আছে, দৈহিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু হোসেন মিয়া? হোসেন মিয়ার মতো কোনো চরিত্র আছে এই পদ্মাপারে? যে কিনা নিজের মতো করে একটি দ্বীপ সাজিয়ে তুলে, সেখানে মানুষজনকে বিনা পয়সায় থাকতে দেয়? আছে? কি বাস্তবে, কি সাহিত্যে?'

আমি আরও একবার সাজিদের সাহিত্যজ্ঞান দেখে বিমুগ্ধ হলাম। সে এমনভাবে চরিত্রগুলোর নামধাম বলে গেল, যেন সে এইমাত্র উপন্যাসটি পড়ে শেষ করেছে।

আমরা রসুলপুরে পৌঁছাই ভোর সাড়ে চারটার দিকে। তখন কিছু কিছু জায়গায় ফজরের আজান পড়ছে। যেখানে নেমেছি, সেখান থেকে বেশ কিছু পথ হাঁটতে হবে। খানিকটা হেঁটে একটা মাটির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বুঝতে পারলাম, এটা মসজিদ। ভেতরে একটি কুপি বাতি মিটমিট করে জ্বলছে।

ব্যাগপত্র রেখে দুজনে অজু করে নিলাম। মসজিদে মানুষও আমরা তিনজন। আজব! তিন সংখ্যাটা দেখি একদম পিছু ছাড়ছে না। লঞ্চেও ছিলাম তিনজন। মসজিদে এসেও তিন।

জামায়াত শেষ হয়েছে একটু আগে। আমরা বসে আছি মসজিদের বারান্দায়। আরেকটু আলো ফুঁটলে বেরিয়ে পড়ব। ইমাম সাহেব আমাদের পাশে বসে কোরআন তিলাওয়াত করছেন। মাঝারি বয়স। দাঁড়িতে মেহেদি লাগিয়েছেন বলে লালচে দেখাচ্ছে। উনি সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত করছেন। 'ফাবি আয়্যি আলা'ই রব্বিকুমা তুকাযযিবান' অংশটিতে এসে খুব সুন্দর করে টান দিচ্ছেন। পরান জুড়ানিয়া টান।

আর-রহমান তিলাওয়াত করে উনি কোরআন শরীফ বন্ধ করলেন। কোরআন শরীফে দুটি চুমু খেলেন। এরপর সেটাকে একবার কপালে আর একবার বুকে লাগিয়ে একটি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে একটা কাঠের তাকে তুলে রাখলেন।

আমরা লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি। লোকটা আমাদের দিকে ফিরে বললেন—'আমনেরা কি শহর হইতে আইছেন?'

সাজিদ বলল—'জ্বি।'

—'আমনেরা কি লেহাপড়া করেন?'

সাজিদ আবার বলল—'জ্বি।'

—'মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আমনেরা শহরে পইড়্যাও বিগড়াইয়া যান নাই। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।'

লোকটার কথা আমি ঠিক বুঝিনি। সাজিদ বুঝেছে। সে জিজ্ঞেস করল—'চাচা, শহরে পড়াশোনা করলে বিগড়িয়ে যায়, আপনাকে কে বলল?'

লোকটা হঠাৎ গম্ভীর মুখ করে বললেন—'হেইয়া আবার কেডায় কইবে বাপ! মোর ঘরেই তো জন্মাইছে একখান সাক্ষাৎ ইবলিশ।'

—'কী রকম?', সাজিদের প্রশ্ন।

—'মোর এক্কুয়াই পোলা। পড়ালেহা করতে পাডাইলাম ঢাকার শহরে। হেইনে যাইয়া কি যে পড়ালেহা করছে! এহন কয়, আল্লা—বিল্লা কইয়া বোলে কিচ্ছু নাই। এই যে, এহন তো বাড়ি আইছে। আইয়া কইতেয়াছে কি বোজজেন? কয় বোলে কোরবানি দিয়া মোরা ধর্মের নামে পশুহত্যা হরি। এইগুলা বোলে ধর্মের নাম ভাইঙ্গা খাওনের ধান্দা হরি মোরা। কিরপিক্যা যে এইডারে ঢাকায় পড়তে পাডাইল্যাম বাপ! হালুডি হরাইলে আইজ এই দিন দেহা লাগতে না!"

লোকটার সব কথা আমি বুঝতে পারিনি। তবে এইটুকু বুঝেছি যে, লোকটার ছেলে ঢাকায় পড়ালেখা করতে এসে নাস্তিক হয়ে গেছে।

সাজিদ বলল–'আপনার ছেলে এখন বাড়িতে আছে?'

–'হ।'

সাজিদ আমার দিকে ফিরে বলল–'দেখেছিস, পদ্মার বুকেও কিন্তু নাস্তিকদের বসবাস আছে। হা হা হা।'

সিদ্ধান্ত হলো ছেলেটার সাথে দেখা করে যাব।

সকাল নটায় ছেলেটার সাথে আমাদের দেখা হলো। বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট হবে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ছেলেটা রাজধানীর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয় নিয়ে পড়ছে। ফাস্ট ইয়ারে। নাম–মো: রফিক।

সাজিদ রফিক নামের ছেলেটার কাছে জিজ্ঞেস করল–'কোরবানি নিয়ে তোমার প্রশ্ন কী?'

ছেলেটা বলল–'এটা একটা কুপ্রথা। এভাবে পশুহত্যা করে উৎসব করার কোনো মানে হয়?'

সাজিদ বলল–'তুমি কি বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু জানো?'

ছেলেটি চোখ বড় বড় করে বলল–'আপনি কি আমাকে বিজ্ঞান শিখাচ্ছেন নাকি? ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম।'

সাজিদ বলল–'তা বেশ। খাদ্যশৃঙ্খল সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানো?'

–'জানি। জানব না কেন?'

–'খাদ্যশৃঙ্খল, প্রকৃতিতে উদ্ভিদ আর প্রাণীর মধ্যকার একটি খাদ্যজাল। যেসব উদ্ভিদ সূর্যের আলো ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে নেয়, তাদের বলা হয় উৎপাদক। এই উৎপাদককে বা সবুজ উদ্ভিদকে যারা খায়, তারা হচ্ছে প্রথম শ্রেণির খাদক...'

ছেলেটা বলল–'মশাই, এসব আমি জানি। আপনার আসল কথা বলুন।'

ছেলেটার কথার মধ্যে কোনো রকম আঞ্চলিকতার টান নেই। তাই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

পাশ থেকে ছেলেটার বাবা বলে উঠলেন–'এ, হেরা বয়সে কোলং তোর চাইয়া বড় অইবে! মান-ইজ্জত দিয়া কথা কইতে পারো না?'

ছেলেটা তার বাবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। সেই দৃষ্টিতে পড়াশোনা জানা ছেলের মূর্খ বাবার প্রতি অবজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট।

সাজিদ বলল–'বেশ। তোমাদের গরু আছে?'

–'আছে।'

–'কয়টা?'

ছেলেটার বাবা বললেন–'হ বাপ, মোগো গরু আছে পাঁচখান। দুইডা গাই, এক্কুয়া ষাঁড় গরু। লগে আবার বাছুরও আছে দুইডা!'

–'আচ্ছা রফিক, ধরো, তোমাদের যে-দুটি গাভী আছে, তারা এ বছর দুটি করে বাচ্চা দিল। তাহলে তোমাদের মোট গরুর সংখ্যা হবে ৯টি। ধরো, তোমরা পশু হত্যায় বিশ্বাসী নও। তাই তোমরা গরুগুলো বিক্রিও করো না। কারণ তোমরা জানো, বিক্রি হলেই গরুগুলো কোথাও না কোথাও কোরবানি হবেই। ধরো, এরপরের বছর গরুগুলো আরও দুটি করে বাচ্চা দিল। মোট গরু তখন ১৩ টি। এরপরের বছর দেখা গেল, বাছুরগুলোর মধ্য থেকে দুটি গাভী হয়ে উঠল, যারা বাচ্চা দেবে। এখন মোট গাভীর সংখ্যা ৪টি। ধরো, ৪টি গাভীই এর পরের বছর আরও দুটি করে বাচ্চা দিল। তাহলে, সে বছর তোমাদের মোট গরুর সংখ্যা কত দাঁড়াল?'

ছেলেটির বাবা আঙুলে হিসাব কষে বললেন–'হ, ১৯টা অইবে!'

সাজিদ বলল–'বলো তো রফিক, ১৯টা গরু রাখার এত জায়গা তোমাদের আছে কিনা? ১৯টা গরুকে খাওয়ানোর এত সামর্থ্য, পর্যাপ্ত ভুসি, খৈল, ঘাস আছে কিনা তোমাদের?'

–'না।', ছেলেটা বলল।

–'তাহলে, আল্টিমেইটলি তোমাদের কিছু গরু বিক্রি করে দিতে হবে। এদের যারা কিনবে তারা তো গরু কিনে গুদামে ভরবে না, তাই না? তারা গরুগুলোকে জবাই করে মাংস বিক্রি করবে। গরুর মাংস আমিষের চাহিদা পূরণ করবে, আর চামড়াগুলো শিল্পের কাজে লাগবে, তাই না?'

–'হুম।'

–'এটা হলো প্রকৃতির ব্যালেন্স। তাহলে, প্রকৃতির ব্যালেন্স ঠিক রাখার জন্য পশুগুলোকে জবাই করতেই হচ্ছে। সেটা এমনি হোক, অথবা কোরবানি করে।'

ছেলেটা বলল–'সেটা নিয়ে তো আপত্তি নেই। আপত্তি হচ্ছে, এটাকে ঘিরে উৎসব হবে কেন?'

সাজিদ বলল–'বেশ! উৎসব বলতে তুমি হয়তো মিন করছ, যেখানে নাচগান হয়, ফূর্তি হয়, আড্ডা, ড্রিংকস হয়। মিছিল হয়, শোভাযাত্রা হয়, তাই না? কিন্তু দেখো,

মুসলমানদের এই উৎসব সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে নাচগান নেই, আড্ডা-মাস্তি নেই। ড্রিংকস নেই, মিছিল শোভাযাত্রা নেই। আছে ত্যাগ আর তাকওয়ার পরীক্ষা। আছে অসহায়দের মুখে হাসি ফোটানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা তদবির। সমাজ থেকে শ্রেণি বৈষম্য দূর করে, ধনী-গরিব সবার সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়। এরকম উৎসবে সম্ভবত কার্ল মার্ক্সেরও দ্বিমত থাকার কথা নয়। কার্ল মার্ক্সকে চেনো?'

ছেলেটা এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর বলল–'আরজ আলি মাতুব্বরকে চেনেন আপনি?'

সাজিদ বলল–'হ্যাঁ, চিনি তো।'

–'কোরবানি নিয়ে উনার কিছু যৌক্তিক প্রশ্ন আছে।'

–'কী প্রশ্ন, বলো?'

ছেলেটা প্রথম প্রশ্নটি বলল। সেটি ছিল–

'আল্লাহ্ ইব্রাহীমের কাছে তার সবচাইতে প্রিয় বস্তু উৎসর্গের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু, ইব্রাহীমের কাছে সবচাইতে প্রিয় বস্তু তার ছেলে ইসমাঈল না হয়ে তার নিজ প্রাণ কেন হলো না?'

সাজিদ মুচকি হেসে বলল–'খুবই লজিক্যাল প্রশ্ন বটে। কিন্তু কথা হলো, আল্লাহ যে ইব্রাহীম (আঃ) কে উনার প্রিয় বস্তু উৎসর্গের জন্য বলেছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহোক, ধরে নিলাম যে, আল্লাহ উনাকে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু উৎসর্গের জন্য বলেছিলেন।

'এখন আমি যদি আরজ আলি মাতুব্বরের সাক্ষাৎ পেতাম, তাহলে জিজ্ঞেস করতাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে শহিদ হয়েছে, তাদের কাছে তাদের নিজের প্রাণের চেয়ে দেশটা কেন বেশি প্রিয় হলো? কেন দেশ রক্ষার জন্য নিজেদের প্রাণটাকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিল?

'দুটো জিনিসই একই ব্যাপার। ইব্রাহীম (আঃ) কাছে নিজের চেয়েও প্রিয় ছিল পুত্রের প্রাণ, আর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে নিজের চেয়ে প্রিয় ছিল নিজের মাতৃভূমি।

'কিন্তু, পরীক্ষার ধরন ছিল আলাদা। ইব্রাহীমকে বলা হলো, প্রিয় জিনিস কুরবানি করতে, আর মুক্তিযোদ্ধাদের বলা হলোঃ প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে। কিন্তু, আমরা দেখতে পেলাম, দু'দলের কারও কাছেই প্রিয় বস্তু নিজের প্রাণ নয়। সুতরাং, আরজ আলি মাতুব্বরের মাতব্বরিটা এইখানে ভুল প্রমাণিত হলো।'

ছেলেটা কাচুমাচু করে দ্বিতীয় প্রশ্ন করল। আরজ আলি মাতুব্বর বলেছেন–'আল্লাহ্ পরীক্ষাটা করেছেন ইব্রাহীমকে। ইব্রাহীমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই পরীক্ষাটা কেন তার অনুসারীদের দিতে হবে?'

সাজিদ বলল–'এটাও খুব ভালো প্রশ্ন। আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করি। তাহলে, আমরা কি বলতে পারি যে, কই, আমাদের উপর তো জিব্রাঈল (আঃ) ওহি নিয়ে কখনোই আসেনি। তাহলে, মুহাম্মাদের উপরে আসা ওহি আমরা কেন মানতে যাব? বলো, প্রশ্নটা কি আমরা করতে পারি?'

ছেলেটা চুপ করে আছে। সাজিদ বলল–'আরজ আলি মাতুব্বরের Leader & Leadership বিষয়ে আদতে কোনো জ্ঞানই ছিল না। তাই তিনি এরকম প্রশ্ন করে নিজেকে সক্রেটিস বানাতে চেয়েছিলেন।'

ছেলেটা তার তৃতীয় প্রশ্ন করল–

'আরজ আলি মাতুব্বর বলেছেন, নবী ইব্রাহীমকে তো কেবল পুত্র ইসমাঈলকে কোরবানি করা সংক্রান্ত পরীক্ষাই দিতে হয়নি, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবার মতো কঠিন পরীক্ষাও তাকে দিতে হয়েছিল। তাহলে, মুসলমানরা ইব্রাহীমের স্মৃতি ধরে রাখতে পশু কোরবানি করলেও, ইব্রাহীমের আরেকটি পরীক্ষা মতে, মুসলমানরা নিজেদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে না কেন?'

আরজ আলি মাতুব্বরের আগের প্রশ্নগুলো আমার কাছে শিশুসুলভ মনে হলেও, এই প্রশ্নটিকে অনেক ম্যাচিউরড মনে হলো। আসলেই তো। দুটোই ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য পরীক্ষা ছিল। তাহলে, একটি পরীক্ষার স্মৃতি ধরে রাখতে আমরা যদি পশু কুরবানি করি, তাহলে নিজেদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি না কেন?

পদ্মা থেকে সাঁ সাঁ শব্দে বাতাস আসতে শুরু করেছে।

সাজিদ বলল–'রফিক, তার আগে তুমি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি কি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভালবাসো? তাঁর আদর্শকে?'

ছেলেটা বলল–'অবশ্যই। তিনি না হলে তো বাংলাদেশের অস্তিত্বই থাকত না। তিনি আমাদের জাতির পিতা।'

–'তুমি ঠিক বলেছো। বঙ্গবন্ধু না হলে বাংলাদেশ হয়তো কোনো দিন স্বাধীনই হতো না। সে যাহোক, বঙ্গবন্ধুকে জীবনে দুটি বড় ধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রথমত: একটা দেশকে স্বাধীন করার লড়াইয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া। দ্বিতীয়ত: সপরিবারে খুন হওয়া। আমি কি ঠিক বললাম রফিক?'

–'হু।'

–'এখন, তুমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করো। তুমি ৭১-এর চেতনায় নিজেকে বলীয়ান ভাব। তুমি ৭ই মার্চের স্মরণে বিশাল মিছিলে যোগদান করো। ১৬ই ডিসেম্বরে সভা-সমাবেশে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বলে শ্লোগান দাও। কিন্তু, ১৫ই

অগাস্টে রাস্তায় বেরিয়ে কোনো দিন বলেছো, হে মেজর ডালিমের বংশধর, হে খন্দকার মোশতকের বংশধর, তোমরা কে কোথায় আছো, এসো, আমাকেও বঙ্গবন্ধুর মতো সপরিবারে খুন করো, কখনো বলেছ কি?'

আমি সাজিদের কথা শুনে হো হো হো করে হাসা শুরু করলাম। ছেলেটার মুখ তখন একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সাজিদ আবার বলতে শুরু করল–'তুমি এটা বলো না। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে যারা, এমন কেউই এরকম বলে না। বলা অপ্রাঙ্গিকও বটে। যদি কেউ এরকম বলে, তাহলে তাকে মানুষে বলবে–'কী ব্যাপার? লোকটা পাগল নাকি?' এর অর্থ এটা নয় যে বঙ্গবন্ধুকে তুমি ভালবাসো না।

সাজিদের কথা শুনে এবার রফিকের বাবাও হা হা হা করে হাসতে লাগল। ছেলেকে পরাজিত হতে দেখে পৃথিবীর কোনো বাবা এত খুশি হতে পারে, এই দৃশ্য না দেখলে বুঝতামই না।

আমরা রসুলপুরের পথে হাঁটা ধরলাম। পদ্মাপারের জনবসতিগুলো দেখতে একেবারে ছবির মতো। নিজেকে তখন আমার হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপের বাসিন্দা মনে হচ্ছিল। আর সাজিদ? তাকে আপনারা আপাতত হোসেন মিয়া রূপেই ভাবতে পারেন।

# আল-কুরআন কি মানবরচিত?

বিরাট আলিশান একটি বাড়ি। মোগল আমলের সম্রাটেরা যেরকম বাড়ি বানাত, অনেকটাই সেরকম। বাড়ির সামনে দৃষ্টিনন্দন একটি ফুলের বাগান। বাগানের মাঝে ছোট ছোট কৃত্রিম ঝরনা আছে। এই বাড়ির মালিকের রুচিবোধের প্রশংসা করতেই হয়। ঝঞ্ঝাট ঢাকা শহরের মধ্যে এটি যেন এক টুকরো স্বর্গখণ্ড। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো, বাগানের কোথাও লাল রঙের কোনো ফুল নেই। এতবড় বাগানবাড়ি; অথচ কোথাও একটি গোলাপের চারা পর্যন্ত নেই। বিস্ময়ের ব্যাপার তো বটেই।

আমরা এসেছি সাজিদের এক দূর সম্পর্কের খালুর বাসায়। ঢাকা শহরে বড় ব্যবসা আছে উনার। বিদেশেও নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছেন। ছেলেমেয়েদের কেউ লন্ডন, কেউ কানাডা আর কেউ সুইজারল্যান্ডে থাকে। ভদ্রলোক উনার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকাতেই রয়ে গেছেন। শিকড়ের টানে, জন্মভূমির মায়ায়। তবে ঢাকায় নিজের বাড়িখানাকে যেভাবে তৈরি করেছেন, বোঝার উপায় নেই যে, এটি ঢাকার কোনো বাড়ি নাকি মস্কোর কোনো ভিআইপি ভবন।

আমাকে এদিক সেদিক তাকাতে দেখে সাজিদ প্রশ্ন করল–'এভাবে চোরের এত এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিস কেন?'

আমি ভ্যাবাচেকা খাওয়ার মতো করে বললাম–'না, আসলে তোর খালুকে নিয়ে ভাবছি।'

–'উনাকে নিয়ে ভাবার কী আছে?'

আমি বললাম–'অসুস্থ মানুষদের নিয়ে ভাবতে হয়। এটাও এক প্রকার মানবতা, বুঝলি?'

সাজিদ আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বলল–'অসুস্থ মানে? কে অসুস্থ?'

–'তোর খালু।'

–'তোকে কে বলল উনি অসুস্থ?'

আমি দাঁড়ালাম। বললাম–'তুই এতকিছু খেয়াল করিস, এটা করিসনি?'

–'কোনটা?'

–'তোর খালুর বাগানের কোথাও কিন্তু লাল রঙের কোনো ফুলগাছ নেই। প্রায় সব রঙের ফুলগাছ আছে; লাল ছাড়া। এমনকি, গোলাপের একটি চারাও নেই।'

–'তো?'

–'তো আর কি? তিনি হয়তো কালার ব্লাইন্ড। স্পেসেফিক্যালি, রেড কালার ব্লাইন্ড।'

সাজিদ কিছু বলল না। হয়তো সে এটা নিয়ে আর কোনো কথা বলতে চাচ্ছে না অথবা আমার যুক্তিতে সে হার মেনেছে।

সাজিদ কলিংবেল বাজাল।

ঘরের দরজা খুলে দিল একটি তের-চৌদ্দ বছর বয়সী ছেলে। সম্ভবত কাজের ছেলে।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ছেলেটি বলল–'আপনারা এখানে বসুন। আমি কাকাকে ডেকে দিচ্ছি।'

ছেলেটা একদম শুদ্ধ বাংলায় কথা বলছে। বাড়ির মালিককে স্যার বা মালিক না বলে কাকা বলছে। সম্ভবত, উনার কোনো গরীব আত্মীয়ের ছেলে হবে। যাদের খুব বেশি টাকাপয়সা হয়, তারা গ্রাম থেকে গরিব আত্মীয়দের বাসার কাজের চাকরি দিয়ে দয়া করে।

ছেলেটা ভদ্রলোককে ডাকার জন্য সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। ঘরের ভেতরটা আরও চমৎকার। নানান ধরনের দামি দামি মার্বেল পাথর দিয়ে দেওয়াল সাজানো।

দুতলার কোনো এক রুম থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর ভেসে আসছে–'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে...'

আমি সাজিদকে বললাম–'কি রে, তোর এরকম মোগলাই স্টাইলের একটা খালু আছে, কোনোদিন বললি না যে?'

সাজিদ রসকষহীন চেহারায় বলল–'মোগলাই স্টাইলের খালু তো, তাই বলা হয়নি।'

–'তোর খালুর নাম কী?'

–'এম. এম. আলি।'

ভদ্রলোকের নামটাও উনার বাড়ির মতোই গাম্ভীর্যপূর্ণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম–'এম. এম. আলি মানে কী?'

সাজিদ আমার দিকে তাকাল। বলল–'মোহাম্মদ মহব্বত আলি।'

ভদ্রলোকের বাড়ি আর ঐশ্বর্যের সাথে নামটা একদম যাচ্ছে না। এজন্যে হয়তো মোহাম্মদ মহব্বত আলি নামটাকে শর্টকাট করে এম. এম. আলি করে নিয়েছেন।

ভদ্রলোক আমাদের সামনের সোফায় পায়ের উপর পা তুলে বসলেন। মধ্যবয়স্ক মানুষ। চেহারায় বার্ধক্যের কোনো ছাপ নেই। চুল পেকেছে, তবে কলপ করায় তা ভালোমতো বোঝা যাচ্ছে না।

তিনি বললেন–'তোমাদের মধ্যে সাজিদ কে?'

আমি লোকটার প্রশ্ন শুনে অবাক হলাম খুব। সাজিদের খালু, অথচ সাজিদকে চেনে না। এটা কী রকম কথা?

সাজিদ বলল–'জ্বি, আমি।'

–'হুম, I guessed that', লোকটা বলল। আরও বলল–'তোমার কথা বেশ শুনেছি, তাই তোমার সাথে আলাপ করার ইচ্ছে জাগল।'

আমাদের কেউ কিছু বললাম না। চুপ করে আছি।

লোকটা আবার বলল–'প্রথমে আমার সম্পর্কে দরকারি কিছু কথা বলে নিই। আমার পরিচয় তো তুমি জানোই, সাজিদ। যেটা জানো না, সেটা হলো, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে আমি একজন অবিশ্বাসী। খাঁটি বাংলায় নাস্তিক। রুবায়েত আজাদকে তো চেনো, তাই না? আমরা একই ব্যাচের ছিলাম। আমি নাস্তিক হলেও আমার ছেলেমেয়েরা কেউই নাস্তিক নয়। সে যাহোক, এটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।'

সাজিদ বলল–'খালু, আমি এসব জানি।'

লোকটা অবাক হবার ভান করে বলল–'জানো? ভেরি গুড। ক্লেভার বয়।'

–'খালু, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন তা বলুন।'

–'ওয়েট! তাড়াহুড়ো কীসের?', লোকটা বলল।

এর মধ্যেই কাজের ছেলেটা ট্রেতে করে চা নিয়ে এল।

আমরা চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। লোকটাকে একটি আলাদা কাপে করে চা দেওয়া হলো। সেটা চা নাকি কফি, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

লোকটি বলল–'সাজিদ, আমি মনে করি, তোমাদের ধর্মগ্রন্থ, আই মিন আল-কোরান, সেটা কোনো ঐশী গ্রন্থ নয়। এটা মুহাম্মদের নিজের লেখা একটি বই। মুহাম্মদ করেছে কি, এটাকে জাস্ট স্রষ্টার বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছে।'

এটুকু বলে লোকটা আমাদের দুজনের দিকে তাকাল। হয়তো বোঝার চেষ্টা করল আমাদের রিঅ্যাকশান কী হয়। আমরা কিছু বলার আগেই লোকটি আবার বলল–'হয়তো বলবে, মুহাম্মদ লিখতে-পড়তে জানত না। সে কীভাবে এরকম একটি গ্রন্থ লিখবে? ওয়েল! এটি খুবই লেইম লজিক। মুহাম্মদ লিখতে পড়তে না জানলে কি হবে, তার ফলোয়ারদের অনেকে লিখতে-পড়তে পারত। উচ্চশিক্ষিত ছিল। তারা করেছে কাজটা; মুহাম্মদের ইশারায়।'

সাজিদ তার কাপে শেষ চুমুক দিল। তখনও সে চুপচাপ।

লোকটা বলল–'কিছু মনে না করলে আমি একটি সিগারেট ধরাতে পারি? অবশ্য, কাজটি ঠিক হবে না জানি।'

আমি বললাম–'শিওর!'

এতক্ষণ পরে লোকটি আমার দিকে ভালো করে তাকাল। একটি মুচকি হাসি দিয়ে বলল–'Thank You...'

সাজিদ বলল–'খালু, আপনি খুবই লজিক্যাল কথা বলেছেন। কোরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিজের বানানো হতেও পারে। কারণ কোরআন-যে ফেরেশতা নিয়ে আসত বলে দাবি করা হয়, সেই জিব্রাঈল (আঃ)-কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া কেউই কোনোদিন দেখেনি।'

লোকটা বলে উঠল–'এক্স্যাক্টলি, মাই সান।'

–'তাহলে, কোরআনকে আমরা টেস্ট করতে পারি, কী বলেন খালু?'

–'হ্যাঁ হ্যাঁ, করা যায়...।' বেশ উৎসাহী হয়ে উঠলেন তিনি।

সাজিদ বলল–'কোরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বানানো কি না, তা বুঝতে হলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্রষ্টার কোনো দূত নন। তিনি খুবই সাধারণ, অশিক্ষিত একজন প্রাচীন মানুষ।'

লোকটা বলল–'সত্যিকার অর্থেই মুহাম্মদ অসাধারণ কোনো লোক ছিল না। স্রষ্টার দূত তো পুরোটাই ভুয়া।'

সাজিদ মুচকি হাসল। বলল–'তাহলে এটাই ধরে নিই?'

–'হুম।', লোকটার সম্মতি।

সাজিদ বলতে লাগল–'খালু, ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, হজরত ইউসুফ (আঃ)-এর জন্ম হয়েছিল বর্তমান ফিলিস্তিনে। ইউসুফ (আঃ) ছিলেন হজরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কনিষ্ঠতম পুত্র। ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে ইউসুফ

(আঃ) ছিলেন প্রাণাধিক প্রিয়। কিন্তু, ইয়াকুব (আঃ)-এর এই ভালোবাসা ইউসুফ (আঃ)-এর জন্য কাল হলো। তাঁর ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে নিক্ষেপ করে দেয়। এরপর, কিছু বণিক কূপ থেকে ইউসুফ (আঃ)-কে উদ্ধার করে তাকে মিসরে নিয়ে আসে। তিনি মিসরের রাজপরিবারে বড় হোন। ইতিহাস মতে, এটি ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের আমেনহোটেপের রাজত্বকালের আরও তিন শ বছর পূর্বে। খালু, এই বিষয়ে আপনার কোনো দ্বিমত আছে?'

লোকটা বলল–'নাহ। কিন্তু, এগুলো দিয়ে তুমি কী বোঝাতে চাও?'

সাজিদ বলল–'খালু, ইতিহাস থেকে আমরা আরও জানতে পারি, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে চতুর্থ আমেনহোটেপের আগে যেসব শাসক মিসরকে শাসন করেছে, তাদের সবাইকেই 'রাজা' বলে ডাকা হতো। কিন্তু, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চতুর্থ আমেনহোটেপের পরে যেসব শাসক মিসরকে শাসন করেছিল, তাদের সবাইকে 'ফেরাউন' বলে ডাকা হতো। ইউসুফ (আঃ) মিশরকে শাসন করেছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের চতুর্থ আমেনহোটেপের আগে। আর, মূসা (আঃ) মিসরে জন্মলাভ করেছিলেন চতুর্থ আমেনহোটেপের কমপক্ষে আরও দু শ বছর পরে। অর্থাৎ, মূসা (আঃ) যখন মিসরে জন্মগ্রহণ করেন, তখন মিসরের শাসকদের আর 'রাজা' বলা হতো না, 'ফেরাউন' বলা হতো।'

–'হুম, তো?'

–'কিন্তু খালু, কোরআনে ইউসুফ (আঃ) এবং মূসা (আঃ) দুজনের কথাই আছে। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, কোরআন ইউসুফ (আঃ)-এর বেলায় শাসকদের ক্ষেত্রে 'রাজা' শব্দ ব্যবহার করলেও, একই দেশের, মূসা (আঃ)-এর সময়কার শাসকদের বেলায় ব্যবহার করেছে 'ফেরাউন' শব্দটি। বলুন তো খালু, মরুভূমির বালুতে উট চরানো বালক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিহাসের এই পাঠ কোথায় পেলেন? তিনি কীভাবে জানতেন যে, ইউসুফ (আঃ)-এর সময়ের শাসকদের 'রাজা' বলা হতো, মূসা (আঃ)-এর সময়কার শাসকদের 'ফেরাউন'? এবং ঠিক সেই মতো শব্দ ব্যবহার করে তাদের পরিচয় দেওয়া হলো?'

মহব্বত আলি নামের ভদ্রলোকটি হো হো হো করে হাসতে লাগল। বলল–'মূসা আর ইউসুফের কাহিনি তো বাইবেলেও ছিল। মুহাম্মদ সেখান থেকে কপি করেছে; সিম্পল।'

সাজিদ মুচকি হেসে বলল–'খালু, ম্যাটার অফ সরো দ্যাট, বাইবেল এই জায়গায় চরম একটি ভুল করেছে। বাইবেল ইউসুফ (আঃ) এবং মূসা (আঃ) দুজনের সময়কার শাসকদের জন্যই 'ফেরাউন' শব্দ ব্যবহার করেছে, যা ঐতিহাসিক ভুল। আপনি চাইলে আমি আপনাকে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে প্রমাণ দেখাতে পারি।'

লোকটা কিছুই বলল না। চুপ করে আছে। সম্ভবত, উনার প্রমাণ দরকার হচ্ছে না।

সাজিদ বলল–'যে-ভুল বাইবেল করেছে, সে-ভুল অশিক্ষিত আরবের বালক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে ঠিক করে দিলেন, তা কীভাবে সম্ভব; যদি না তিনি কোনো প্রেরিত দূত হোন, আর কোরআন কোনো ঐশী গ্রন্থ না হয়?'

লোকটি চুপ করে আছে। এর মধ্যেই তিনটি সিগারেট খেয়ে শেষ করেছে। নতুন আরেকটি ধরাতে ধরাতে বলল–'হুম, কিছুটা যৌক্তিক।'

সাজিদ আবার বলতে লাগল–'খালু, কোরআনে একটি সূরা আছে, সূরা আল-ফাজর নামে। এই সূরার ৬ নম্বর আয়াতটি এরকম: 'তোমরা কি লক্ষ করোনি, তোমাদের পালনকর্তা ইরাম গোত্রের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন?'

'এই সূরা ফাজরে মূলত আদ জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আদ জাতির আলাপের মধ্যে হঠাৎ করে 'ইরাম' নামে একটি শব্দ চলে এল; যা কেউই জানত না এটা আসলে কি। কেউ কেউ বললঃ এটা আদ জাতির কোনো বীর পালোয়ানের নাম, কেউ কেউ বলল: এই ইরাম হতে পারে আদ জাতির শারীরিক কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য, কারণ এই সূরায় আদ জাতির শক্তিমত্তা নিয়েও আয়াত আছে। মোদ্দাকথা, এই 'ইরাম' আসলে কী, সেটার সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা কেউই দিতে পারেনি তখন। এমনকি, গোটা পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে 'ইরাম' নিয়ে কিছুই বলা ছিল না। কিন্তু, ১৯৭৩ সালে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সিরিয়ায় মাটির নিচে একটি শহরের সন্ধান পায়। এই শহরটি ছিল আদ জাতির শহর। সেই শহরে পাওয়া যায়, সুপ্রাচীন উঁচু উঁচু দালান। এমনকি, এই শহরে আবিষ্কার হয় তখনকার একটি লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিতে একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় তারা যে-সকল শহরের সাথে বাণিজ্য করত, সেসব শহরের নাম উল্লেখ ছিল। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য এই যে, সেই তালিকায় 'ইরাম' নামের একটি শহরের নামও পাওয়া যায়, যেটা আদ জাতিদেরই একটি শহর ছিল। শহরটি ছিল একটি পাহাড়ের মধ্যে। এতেও ছিল সুউচ্চ দালান।

'চিন্তা করুন, যে 'ইরাম' শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা এর পূর্বে তাফসিরকারকগণও করতে পারেনি–কেউ এটাকে বীরের নাম, কেউ এটাকে আদ জাতির শারীরিক বৈশিষ্ট্যের নাম বলে ব্যাখ্যা করেছে–১৯৭৩ সালের আগে যে-'ইরাম' শহরের সন্ধান পৃথিবীর তাবৎ ইতিহাসে ছিল না–কোনো ভূগোলবিদ, ইতিহাসবিদই এই শহর সম্পর্কে কিছুই জানত না–প্রায় ৪৩ শত বছর আগের আদ জাতিদের সেই শহরের নাম কীভাবে কোরআন উল্লেখ করল? যেটা আমরা জেনেছি ১৯৭৩ সালে, সেটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে আরবের মরুভূমিতে বসে ১৪০০

বছর আগে জানল? হাউ পসিবল? তিনি তো অশিক্ষিত ছিলেন। কোনোদিন ইতিহাস বা ভূগোল পড়েননি। কীভাবে জানলেন, খালু?'

আমি খেয়াল করলাম, লোকটার চেহারা থেকে মোগলাই ভাবটা সরে যেতে শুরু করেছে। পুত্রতুল্য ছেলের কাছ থেকে তিনি এতটা শক খাবেন; হয়তো আশা করেননি।

সাজিদ আবার বলতে লাগল–'খালু, আর-রহমান নামে কোরআনে একটি সূরা আছে। এই সূরার ৩৩ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে–'হে জিন ও মানুষ জাতি! তোমরা যদি আসমান ও জমিনের সীমানায় প্রবেশ করতে পারো, তবে করো। যদিও তোমরা তা পারবে না প্রবল শক্তি ছাড়া।'

'মজার ব্যাপার হলো, এই আয়াতটি মহাকাশ ভ্রমণ নিয়ে। চিন্তা করুন, আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের আরবের লোক, যাদের কাছে যানবাহন বলতে ছিল কেবল উট আর গাধা, ঠিক সেই সময়ে বসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহাকাশ ভ্রমণ নিয়ে কথা বলছেন, ভাবা যায়?

'সে যাহোক; আয়াতটিতে বলা হলো, 'যদি পারো আসমান ও জমিনের সীমানায় প্রবেশ করতে, তবে করো; এটি একটি কন্ডিশনাল (শর্তবাচক) বাক্য। এই বাক্যে শর্ত দেওয়ার জন্য If (যদি) ব্যবহার করা হয়েছে।

'খালু, আপনি যদি অ্যারাবিক ডিকশনারি দেখেন, তাহলে দেখবেন, আরবিতে 'যদি' শব্দের জন্য দুটি শব্দ আছে। একটি হলো 'লাও', অন্যটি হলো 'ইন'। দুটোর অর্থই 'যদি'। কিন্তু, এই দুটোর মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। আরবিতে শর্তবাচক বাক্যে 'লাও' তখনই ব্যবহার করা হয়, যখন সেই শর্ত কোনোভাবেই পূরণ সম্ভব হবে না। কিন্তু, শর্তবাচক বাক্যে 'যদি' শব্দের জন্য যখন 'ইন' ব্যবহার করা হয়, তখন সেই শর্ত পূরণ হতেও পারে।

'আশ্চর্যজনক ব্যাপার, কোরআনে সূরা আর-রহমানের ৩৩ নম্বর আয়াতটিতে 'লাও' ব্যবহার না করে 'ইন' ব্যবহার করা হয়েছে। মানে, কোনো একদিন জিন ও মানুষেরা মহাকাশ ভ্রমণে সফল হবে। আজকে কি মানুষ মহাকাশ জয় করেনি? মানুষ চাঁদে যায়নি? মঙ্গলে যাচ্ছে না?

'দেখুন, ১৪০০ বছর আগে যখন মানুষের ধারণা ছিল একটি ষাঁড় তার দুই শিঙের মধ্যে পৃথিবীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তখন কোরআন ঘোষণা করছে, মহাকাশ ভ্রমণের কথা। সাথে বলেও দিচ্ছে, একদিন তা আমরা পারব। আরবের নিরক্ষর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে এই কথা বলতে পারেন?'

এম. এম. আলি ওরফে মোহাম্মদ মহব্বত আলি নামের এই ভদ্রলোকের চেহারা থেকে 'আমি নাস্তিক, আমি একেবারে নির্ভুল টাইপ ভাবটা একেবারে উধাও হয়ে গেল। এখন তাকে যুদ্ধাহত এক ক্লান্ত সৈনিকের মতো দেখাচ্ছে।

সাজিদ বলল–'খালু, খুব অল্প পরিমাণ বললাম। এরকম আরও শ খানেক যুক্তি দিতে পারব, যা দিয়ে প্রমাণ করে দেওয়া যায়, কোরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লেখা কোনো কিতাব নয়, এটি স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসা একটি ঐশী গ্রন্থ। যদি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের প্রভাব বিস্তারের জন্য এই কিতাব লিখেছেন, আপনাকে বলতে হয়, এই কিতাবের জন্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বরণ করতে হয়েছে অবর্ণনীয় কষ্ট ও যন্ত্রণা। এই কিতাবের বাণী প্রচার করতে গিয়েই তিনি স্বদেশ ছাড়া হয়েছিলেন। তাকে বলা হয়েছিল, তিনি যা প্রচার করছেন তা থেকে বিরত হলে তাকে মক্কার রাজত্ব দেওয়া হবে। তিনি তা গ্রহণ করেননি। খালু, নিজের ভালো তো পাগলও বোঝে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝল না কেন? এসবই কি প্রমাণ করে না কোরআনের ঐশী সত্যতা?'

লোকটা কোনো কথাই বলছে না। সিগারেটের প্যাকেটে আর কোনো সিগারেট নেই।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। বের হতে যাব, অমনি সাজিদ ঘাড় ফিরিয়ে লোকটাকে বলল–'খালু, একটি ছোট প্রশ্ন ছিল।'

–'বলো।'

–'আপনার বাগানে লাল রঙের কোনো ফুল গাছ নেই কেন?'

লোকটি বলল–'আমি রেড কালার ব্লাইন্ড। লাল রঙ দেখি না।'

সাজিদ আমার দিকে ফিরল। অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল–'বাবা আরিফ, ইউ আর কারেক্ট!'

# রিলেটিভিটির গল্প

বুধবার। মফিজুর রহমান স্যার পুরো একঘণ্টা ধরে আইনস্টাইনের 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' বোঝালেন ক্লাসে। যদিও ফিজিক্স সাজিদের সাবজেক্ট নয়, তবে মাঝেমাঝেই স্যার এসব নিয়ে কথা বলেন। আজ যেমন বলেছেন থিওরি অব রিলেটিভিটি নিয়ে। এই থিওরি কী, কখন আবিষ্কৃত হয়, কীভাবে কাজ করে এসব একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোঝানোর পরে তিনি পুরো দুই গ্লাস পানি পান করলেন। পানি পান শেষে বললেন, 'এখন আমি পরীক্ষা করব কে কী রকম বুঝেছ। এখানে একজন একজন এসে বুঝিয়ে যাও।'

বুধবারে মফিজ স্যারের ক্লাসের এই এক জ্বালা। টানা একঘণ্টা ক্লাস নেওয়ার পরে আরও টানা একঘণ্টা নেবেন সেটার প্রেজেন্টেশান। অনুপস্থিত থাকারও সুযোগ নেই। ডিপার্টমেন্টে এই একজনই আছেন যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এখনো বেঞ্চের উপরে তুলে দাঁড় করিয়ে রেখে ক্লাস মিস করার শাস্তি দেন। কি বিদঘুটে ব্যাপার!

মফিজ স্যারের টানা একঘণ্টার লেকচার থেকে যে যতটুকু গলাধঃকরণ করতে পেরেছে, সেটা একে একে সবাই আবার উগরে দিয়ে আসতে লাগল।

কেউ ৫ মিনিট, কেউ ৭ মিনিট, কেউবা ৮ মিনিট করে লেকচারটার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। সবাই 'থিওরি অব রিলেটিভিটি'র বিভিন্ন দিক নিয়ে বলতে লাগল।

সবার শেষে এল সাজিদের পালা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাজিদকে চার-পাঁচ মিনিটের একটি লেকচার ঝেড়ে আসতে হবে এখন।

সাজিদ উঠে এল। মফিজ স্যার উনার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মুচকি হেসে বললেন, 'সমাপ্তি পর্বে এবার মহামতি আইনস্টাইনের কাছ থেকে আমরা সবচেয়ে চমকপ্রদ কিছু শুনব। You may start Sir Mr. Einstein...

মফিজ স্যারের বিদ্রুপাত্মক বাক্য ব্যয় অন্যদের জন্য সবসময় হাসির খোরাক। ক্লাসের সবাই হো হো হো করে হেসে উঠল। ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়, তাই সাজিদ এখন আর এসব গায়ে মাখে না।

সাজিদ হাসি হাসি মুখে শুরু করল–

'বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' একদম পানির মতো সোজা। এটা এতই সোজা যে, ক্লাস এইটের একটা বাচ্চাও এটাকে খুব সহজে বুঝে নিতে পারে।'

এতটুকু শুনে সবাই সাজিদের দিকে বড় বড় চোখে হাঁ করে তাকাল। মফিজ স্যার চেয়ারে হেলান দেওয়া অবস্থাতে ছিলেন। সাজিদের কথা শুনে উনি একটু নড়েচড়ে বসলেন। উনার মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটিকে ঠিকঠাক করে নিয়ে বললেন, 'Come to the point...'

সাজিদ বলল–'স্যার, আমি তো পয়েন্টেই আছি। আমি কি বলব নাকি বসে পড়ব?'

'No no, carry on', মফিজ স্যারের প্রতিউত্তর।

সাজিদ আবার শুরু করল–

'এই সোজা থিওরিটিকেই একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সবচে বড় আবিষ্কার এবং এর আবিষ্কারক মহামতি আইনস্টাইনকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী মনে করা হয়।

'এতক্ষণ আমাদের সবার প্রিয়, শ্রদ্ধেয় মফিজুর রহমান স্যার আমাদের খুব সুন্দর করে বোঝালেন জিনিসটা। এরপর আমার বন্ধুরাও এই থিওরির নানান দিক খুব সুন্দর করে বর্ণনা করে গেল। যেহেতু আমাকেও কিছু বলতে হবে, তাই আমি এই থিওরির সবচে মজার দিক, 'Time Dilation' নিয়েই বলব। এই থিওরিটি 'সময়' নিয়ে আমাদের যেভাবে ভাবাতে পেরেছে, বিজ্ঞানের অন্য কোনো আবিষ্কার তা পারেনি।

'সময় নিয়ে আগেকার মানুষদের ধারণা ছিল অন্যরকম। তারা ভাবত, সময় সবখানে সমান। অর্থাৎ, আমার কাছে যেটা একঘণ্টা , সেটা অন্য কোনো গ্রহের, অন্য কোনো প্রাণীর কাছেও একঘণ্টা। আমার কাছে যেটা একদিন, সেটা অন্য সবার কাছেও একদিন। অর্থাৎ, মাত্রাভেদে সময়ের কোনোই পরিবর্তন হয় না।

'১৯০০ সাল পর্যন্ত সময় নিয়ে পৃথিবীর মানুষের ধারণা ছিল এরকম। উনিশ শ সালের কিছু আগে বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক এইচ.জি. ওয়েলস সময় নিয়ে কিছু ব্যতিক্রম লেখাজোখা করেন। তিনি তাঁর কিছু সাইন্স ফিকশানে দেখান যে, তাঁর সৃষ্ট কিছু চরিত্র 'বর্তমান'কে পাশ কাটিয়ে ভবিষ্যতের সময়ে চলে যাচ্ছে। অতীতে চলে যাচ্ছে। এইচ.জি. ওয়েলস তাঁর এই কথাগুলোকে সাইন্স ফিকশনে ঠাঁই দিলেও, তখনো মানুষের মনে প্রশ্ন ছিল–'সত্যিই কি মানুষ কোনোদিন ভবিষ্যতে যেতে পারবে? অতীতে যেতে পারবে?'

'আইনস্টাইনের আগ পর্যন্ত এটা সাইন্স ফিকশনে থাকলেও, আইনস্টাইন এসে প্রমাণ করে দেখালেন যে, হ্যাঁ, মানুষ চাইলেই ভবিষ্যৎ ভ্রমণ করতে পারে।

'কিন্তু কীভাবে? মজাটা এখানেই। আগেকার দিনে মানুষ ভাবত, সময় সর্বস্থানে, সর্বাবস্থায়, সর্বমাত্রায় একই রকম। ঐ যে একটু আগে বললাম, আমার কাছে যেটা একদিন, পৃথিবীর অন্য কোথাও বা অন্য কোনো গ্রহে অন্য কারও কাছেও সেটা একদিন।

'কিন্তু আইনস্টাইন এসে বললেন, 'না, সময় ঠিক এরকম নয়। মাত্রাভেদে সময় পাল্টে যায়।

'কিন্তু কীভাবে? আইনস্টাইন বলেছেন, কম গতিশীল কোনো বস্তুতে সময় অধিক পরিমাণ দ্রুত চলে। আর যে-বস্তু অধিক গতিতে চলে, তার সময়ও তুলনামূলক কম গতিসম্পন্ন বস্তুর চেয়ে কম দ্রুত চলে। আর এটাকেই বলা হয় 'Time Dilation.'

'অর্থাৎ, যে-বস্তুর গতি কম, তার সময় চলবে দ্রুত। আর, যে বস্তুর গতি বেশি, তার সময় চলবে আস্তে। ব্যাপারটি কেমন জগাখিচুড়ি জগাখিচুড়ি মনে হচ্ছে, তাই না?

'কিন্তু আইনস্টাইন এটাকে ম্যাথম্যাটিক্যালি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

'ব্যাপারটিকে বোঝানোর জন্য ১৯৮০ সালে বৈজ্ঞানিক লেখক কার্ল সেগান তাঁর বিখ্যাত 'কসমস' সিরিজে পুরো একটি পর্ব করেছেন। কার্ল সেগান তার সেই সিরিজে এই পর্বের নাম রেখেছেন 'টুইন প্যারাডক্স' বা 'যমজ বিভ্রান্তি।'

শুধু কার্ল সেগান নয়, Time Dilation-এর উপর ভিত্তি করে হলিউডে ব্লকবাস্টার মুভিও তৈরি হয়েছে ২০১4 সালেঃ Interstellar.

'ধরা যাক, আমি আর আমার এক জমজ ভাই। আমাদের দুজনের বয়স এখন ১৮ করে।

'হঠাৎ করে আমার মাথায় ভূত চাপল যে, আমি স্পেসশিপে করে মহাবিশ্ব ভ্রমণে বের হব। পৃথিবী থেকে পাঁচহাজার আলোকবর্ষের মধ্যে যা কিছু আছে, তা আমি দেখে আসব। কিন্তু সেটা মাত্র তিন বছরের মধ্যে। অর্থাৎ, স্পেসশিপ নিয়ে আমি মহাবিশ্ব ভ্রমণে বের হলে তিন বছরের মধ্যে পাঁচ হাজার আলোকবর্ষ ভ্রমণ করে আসব।

'এখন, কথা হচ্ছে, তিন বছরের মধ্যে আমি যদি তিনশত আলোকবর্ষ ভ্রমণ করে পৃথিবীতে ফিরতে চাই, আমার স্পেসশিপটাকে তো আলোর গতির (সেকেন্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল) কাছাকাছি গতিতে ছুটতে হবে। তা না হলে এটা কোনোদিনও সম্ভব নয়। কিন্তু আইনস্টাইন এটিও বলেছেন, কোনো বস্তু কোনোদিনও আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে ছুটতে পারবে না। এটা অসম্ভব।

'ধরে নিলাম, আইনস্টাইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমি আর আমার ভাই সেরকম একটি স্পেসশিপ তৈরি করে ফেললাম যা ছুটবে প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল।

'আমি আমার ভাইয়ের কাছ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নিলাম। ২০১৬ সালের ২৫শে নভেম্বর আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্পেসশিপে করে রওনা হলাম মহাশূন্যের পথে। যখন বিদায় নিচ্ছি, তখন দুজনেরই বয়স ঠিক কাটায় কাটায় ১৮ করে।'

এতটুকু বলার পরে সাজিদ একটু থামল। কারও মুখে কোনো কথা নেই। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। মফিজ স্যারও। তাদের কাছে ব্যাপারটা জানা থাকলেও এভাবে হয়তো ইন্টারেস্টিং লাগছে।

সাজিদ আবার বলতে শুরু করল–

'এখানেই থিওরির মজা। আইনস্টাইন বলেছেন, যেহেতু আমার ভাই পৃথিবীতে আছে আর আমি আলোর কাছাকাছি গতির একটি স্পেসশিপে, সেহেতু আমার গতি (মানে স্পেসশিপের গতি) আমার ভাইয়ের তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

'এখন থিওরি মতে, গতিশীল বস্তুতে সময় কম দ্রুত চলে। তাহলে আমার সময় চলবে আস্তে। থিওরি আবার বলেছে, কম গতিশীল বস্তুতে সময় অত্যন্ত দ্রুত চলে। তাহলে, আমার ভাইয়ের সময়গুলো চলবে দ্রুত।

'এখন আরও ধরি, স্পেসশিপে যাবার সময় আমার হাতে যে-ঘড়ি ছিল, সেই ঘড়ির সময় অনুযায়ী আমি ঠিক কাঁটায় কাঁটায় তিন বছর পরে তিনশত আলোকবর্ষ ভ্রমণ করে পৃথিবীতে এলাম।

'তাহলে তখন আমার বয়স কত? ১৮+৩ = ২১।

'পৃথিবীতে এসে যখন আমি আমার ভাইয়ের সামনে যাব, তখন তার বয়স কত হবে? তাঁর বয়সও কি ২১ হবে?

'হা হা হা হা হা। একদম না। আলোর কাছাকাছি গতির স্পেসশিপ নিয়ে আমি যে-তিন বছর মহাশূন্যে কাটিয়ে এসেছি, সে-তিন বছরে পৃথিবীতে পার হয়ে যাবে প্রায় ৫০ বছর। কেন এমনটা হলো? কীভাবে? মাত্রায় আর গতিতে আমার আর আমার ভাইয়ের সময়ের মধ্যে একটা তারতম্য ঘটে গেছে। আমি দ্রুত গতির স্পেসশিপে থাকার কারণে আমার সময় যেখানে (সেটা আমার গতি বিবেচনায় পারফেক্ট) চলেছে, আমার ভাইয়ের সময় সেখানে চলেছে দ্রুত (তার গতির তুলনায় সেটা তাঁর জন্য পারফেক্ট)।

'আমার যমজ ভাই, যাওয়ার সময় যার বয়স ছিল আমার মতোই ১৮, আমি এসে দেখব, সে তখন ৬৮ বছরের একটা বৃদ্ধ। তাঁর হাতে একটা লাঠি। কোমড় নুয়ে গেছে। শরীর ভেঙে পড়েছে।

'এটাকে রূপকথার গল্পের মতো মনে হলেও এটাই সত্যি। এইজন্য কার্ল সেগান এটাকে 'টুইন প্যারাডক্স' বা 'যমজ বিভ্রান্তি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

'এভাবে ২০১৬ সালে এরকম দ্রুত গতির যান নিয়ে মহাবিশ্ব ভ্রমণে বের হয়ে তিন বছর পর এসে আমি চাইলেই ২০৬৬ সালের পৃথিবীকে দেখে ফেলতে পারি মাত্র তিন বছর বয়স বাড়িয়ে। এটাই ভবিষ্যৎ ভ্রমণ। আমার সমবয়সীরা যখন কেউ কবরে, কেউ মৃত্যুশয্যায়, তখনো আমি থাকতে পারি ২১ বছরের টগবগে তরুণ। ব্যাপারটা এরকম। এটাই 'Time Dilation' স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির সবচেয়ে মজার অংশ।'

সাজিদের প্রেজেন্টেশন শেষ। সবাই জোরে জোরে হাততালি দিতে লাগল।

মফিজুর রহমান দাঁড়ালেন। তারপর ব্যঙ্গাত্মকভাবে সাজিদের দিকে তাকিয়ে বললেন–'তোমাদের কোরআনে এই থিওরির ব্যাপারে কি কিছু আছে?'

সাজিদ বুঝতে পারল যে, স্যার তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে চাচ্ছেন। সে মাথা নিচু করে ফেলল।

মফিজ স্যার বললেন, 'না, তোমরাই তো বলো তোমাদের কোরআন আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে নাকি কত কথাই বলেছে সেই ১৪০০ বছর আগে। তাই জানতে চাচ্ছিলাম আর কি এরকম কিছুও বলেছে কি না। হা হা হা হা।'

স্যারের সাথে তাল মিলিয়ে ক্লাসের আরও কয়েকজন হেসে উঠল। এরা তারা, যারা সাজিদকে একদম সহ্য করতে পারে না।

সাজিদ বলল–'স্যার, With due respect, আল-কোরআন বিজ্ঞানের কোনো থিওরিটিক্যাল বই নয় যে এখানে বিজ্ঞানের সবকিছু, সব সাইড নিয়ে বলা থাকবে। এটা মানুষকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে আসেনি। এটার মেইন পারপাস: মানুষ যেন জাগতিক জীবনে সৎ, ন্যায় এবং সুন্দর জীবনযাপন করে, তাকওয়াবান হয়ে পরকালে জান্নাত লাভ করতে পারে। যে-রিক্সাওয়ালা থিওরি অফ রিলেটিভিটি বোঝে না বা কখনো বুঝবে না, সে যদি সৎ হয়, ঈমানদার হয়, তাকওয়াবান হয় তাহলে পরকালে সেও জান্নাতে যাবে।'

মফিজ স্যার বললেন, 'ও, তার মানে কোরআনে এরকম কিছুই বলা নেই? আফসোস! আমি ভাবলাম হয়তো থাকবে।'

সাজিদ মাথা তুলে বলল–'জ্বি না স্যার; কোরআনে এরকম কিছু আছে।'

সাজিদের কথা শুনে পুরো ক্লাস থ হয়ে রইল।

সাজিদ বলল–'স্যার, আমি এতক্ষণ স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির যে অংশটি নিয়ে বললাম, সেটার সারমর্ম হলো: সময় দুটি মাত্রায়, দুটি অবস্থায় দুই রকম আচারণ করে। কেন করে সেটাও বললাম। সময়ের ব্যাপারে এত চমকপ্রদ তথ্য আমাদের জানিয়েছেন মহামতি আইনস্টাইন। ১৯০৫ সালে। এর আগে তা আমরা জানতাম না। আমরা জানতাম, সময় সবখানে, সব অবস্থায় সমান।

'শুধু আমরাই নই, সুপ্রাচীনকাল থেকে তাবৎ পৃথিবীর মানুষের ধারণাই ছিল এটা। আল-কোরআন যখন নাজিল হচ্ছে, তখনো আরবের মানুষদের এটাই ধারণা ছিল। তারা কল্পনাও করতে পারত না যে, দুইটা অবস্থানে সময় দুই রকম হতে পারে।

'আমার কাছে যেটা ৩ বছর, আমার ভাইয়ের কাছে সেটা যে ৫০ বছর হতে পারে, তারা সেটা ভাবতেও পারে নি।

'কিন্তু আল-কোরআন এসে তাদের অন্যরকম কিছু জানাল। আল-কোরআন জানাচ্ছে: হ্যাঁ, এটা সম্ভব।'

'আল কোরআন বলছে–

'ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে আরোহণ করে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ (তোমাদের হিসাব মতে) পঞ্চাশ হাজার বছর।', সূরা আল মা'আরিজ: ০৪

'The angels and the Spirit will ascend to Him during a Day the extent of which is fifty thousand years'

'দেখুন, আল্লাহ্ বলছেন যে, ফেরেশতারা এমন একটি দিনে আল্লাহ্‌র কাছে যায় যেটা আমাদের হিসাব মতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

'তাদের ১ দিন = আমাদের ৫০,০০০ বছর।

'তারা মানে কারা? ফেরেশতারা। ফেরেশতারা কীসের তৈরি? নূর, অর্থাৎ আলোর। আলোর গতি কী রকম? সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

'এই আলোর তৈরি ফেরেশতারা এমন একদিনে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায়, যেটা আমাদের গণনায় ৫০,০০০ বছরের সমান।

'এটার সাথে স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটির 'টুইন প্যারাডক্সের' ব্যাপারটা মেলান তো।

'আমি এমন তিন বছরে তিনশত আলোকবর্ষ ভ্রমণ করে এলাম যা আমার যমজ ভাইয়ের হিসাব মতে ৫০ বছরের সমান।'

'আমার তিনবছর = আমার যমজ ভাইয়ের ৫০ বছর।

'ফেরেশতাদের একদিন = আমাদের ৫০,০০০ হাজার বছর।

'এটাই হলো আইনস্টাইনের থিওরির বিশেষ অংশ। এটার নাম Time Dilation.'

'১৫০০ বছর আগে কি করে কেউ ভাবতে পারে যে, সময়ের এরকম পার্থক্য হতে পারে? ইম্পসিবল।

'এটা সেই স্রষ্টা থেকে আসা, যিনি সবকিছুর মতো সময়েরও সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্তাই তো তার সৃষ্ট সময়ের ব্যাপারে জানবেন, তাই না? সময়ের যে-পার্থক্যের ব্যাপারে আমাদের আইনস্টাইন জানালেন ১৯০৫ সালে, সেটা ১৫০০ বছর আগে নিরক্ষর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে জানবেন, যদি না সময়ের সৃষ্টিকর্তাই উনাকে না জানান?

'আপনি বলতে পারেন, আল-কোরআন কি তাহলে এখানে থিওরি অফ রিলেটিভিটি শেখাচ্ছে? একদম না। আমি আগেও বলেছি, কোরআন বিজ্ঞানের কোনো থিওরিটিক্যাল বই নয়। এটা Science এর বই নয়, এটা Sign এর বই। এটা একটা চিরন্তন সত্য; স্রষ্টার কাছ থেকে আসা। তাই এটাতে বিভিন্ন উপমায়, উদাহরণে, ভঙ্গিতে এমন কিছু থাকবে, যা সময়ের সাথে সাথে বিজ্ঞানের সাথেও মিলে যাবে। এতে অবিশ্বাসীদের কাছে এটার গ্রহণযোগ্যতা, এটার বিশ্বাসযোগ্যতা, এটার অথেনটিসিটি বেড়ে যাবে। এই বই তাঁর এসব Sign দিয়ে অবিশ্বাসীদের মনে দাগ কাটবে। যেমন দাগ কেটেছে ড. গ্যারি মিলারের মনে, বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলির মনে, বিজ্ঞানী কিথ মুরদের মনে। যেমন দাগ কাটছে পশ্চিমের হাজার হাজার খ্রিষ্টানদের মনে। এইসব Sign দেখে প্রতিদিন পৃথিবীর আনাচে কানাচে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে শত শত মানুষ।'

ক্লাস পিরিয়ড শেষের দিকে। মফিজুর রহমান স্যার উনার চোখের মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটা খুলে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে হাঁটা ধরলেন। দরজার কাছে গিয়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে সাজিদের দিকে তাকালেন। সাজিদ বলল—'আস্‌সালামু আলাইকুম স্যার।'

# A Letter to David: Jessus Wasn't Myth & He Existed

কম্পিউটারের সামনে উঁবু হয়ে সাজিদ খুব মনোযোগ সহকারে কী যেন লিখছে। জানি না কী লিখছে। তবে যা লিখছে তা খুব যত্ন আর সাবধানে লিখছে তা বোঝা যাচ্ছে। মনে হয় খুব সিরিয়াস কিছু।

আমি জিজ্ঞেস করলাম–'কী লিখছিস?'

–'একটা মেইল পাঠাচ্ছি।'

–'মেইল? কাকে?'

–'ডেভিডকে।'

–'ডেভিডকে? বেড়াতে আসার জন্য বলবি নাকি?'

সাজিদ কিছু না বলে ডেভিডের পাঠানো মেইলটা আমার সামনে ওপেন করল। ডেভিড সম্পর্কে আগে কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার। ডেভিড হলো সাজিদের বিদেশি বন্ধু। তাদের দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায়। সেখানকার একটা বিজ্ঞান মেলায় একবার সাজিদ গিয়েছিল তার বাবার সাথে। তখন সাজিদ মাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। বিজ্ঞান মেলায় ডেভিড এবং তার বন্ধুরা একটি অদ্ভুত যন্ত্র প্রদর্শন করেছিল। যন্ত্রটা অনেকটাই ড্রোনের মতো। যন্ত্রটি প্রদর্শনের সময় ডেভিড যখন এটাকে চালু করতে যাচ্ছিল, সেটা কোনোভাবেই চালু হচ্ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও ডেভিড এবং তার টিম সেটাকে চালু করতে পারছিল না। তখন সাজিদ ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বলেছিল–'Can I help you?'

ডেভিড সাজিদের দিকে তাকিয়ে ছিল বেশ কিছুক্ষণ। এরপর বলল–'Sure.'

সাজিদ টুকটাক করে কিছু কাজ করে দিয়েছিল। ডেভিড, তার টিম, সাজিদের বাবা এবং প্রদর্শনী দেখতে আসা অনেক লোক সাজিদের কাজের দিকে তাকিয়ে আছে। কাজ শেষ করে সাজিদ বলেছিল–'Try now.'

ডেভিড তখনো ভ্যাবলা মার্কা চেহারায় সাজিদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। সাজিদ আবার বলল–'Hello, you can try now, dear.'

ডেভিড আলাভোলা চেহারায় আবারও বলল–'Sure.'

এবার ডেভিডদের যন্ত্রটি চালু হলো। ভোঁৎ ভোঁৎ শব্দ করতে করতে সেটা চোখের পলকেই আকাশে উড়াল দিল। ডেভিডের হাতে একটি রিমোট। রিমোট টিপে যন্ত্রটিকে ডাইরেকশান দিয়ে উপরে-নিচে নামানো হচ্ছে। এপাশ-ওপাশে সরানো হচ্ছে। ডেভিড সাজিদের দিকে ফিরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল–'Hi, I'm David, David Anderson, you?'

সাজিদ মুচকি হেসে বলল–'I'm Sajid.'

–'From?'

–'Bangladesh'

–'Great! Can we be friend, Sajid?'

সাজিদ হাসিমুখে বলল–'Sure, Why not?' সেই থেকে দুজনের বন্ধুত্ব। ডেভিড ইতোমধ্যে একবার বাংলাদেশে দুই সপ্তাহের জন্য বেড়াতেও এসেছিল। সেবার সে যাবার আগে অনেক কষ্টে একটি বাংলা বাক্য শিখে গিয়েছিল। বাক্যটি ছিল–'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

ইংরেজি ভাষাভাষীরা বাংলা 'ত' উচ্চারণ করতে পারে না ঠিকমতো। তারা 'ত' কে 'ট' উচ্চারণ করে। সেবার ডেভিড 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বাক্যটাকে বলছিল এরকম–'আমমি টোমাকে বালো-বাসি।' শুনে মজা পাচ্ছিলাম আমরা। ডেভিডের মেইলটা পড়লাম। মেইলে লেখা ছিল–

'Hi Sajid,

It has been a while since we last spoke. I hope you are well. I have been good. I am writing this letter to you because I would like to discuss something. I am a devoted Christian and I respect my religion. I am sure you can relate. A few days back, I met with some of my friends, all of whom were atheists. I was not bothered by the fact that they did not believe in God or Jesus, but something they said hurt me immensely. They said that Jesus was a creation of Egyptian mythology and he had never existed. I remember you telling me that Islam also honors Jesus and respects him as one of the Prophets. I was wondering, could you send me some accounts of Jesus Christ's existence from some (Non-Christians and Non-Muslims) credible sources that will provide evidence that Jesus really did

exist in history? You would be happy to learn that I have become more fluent in Bangla now; one of my classmates has been helping me out with it. I am eagerly waiting for your reply. ভেবেছিলাম বাংলাদেশে এসে তোমাকে চমকে দেবো, কিন্তু লিখতে বসে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। তুমি আর আরিফ বেড়াতে এসো। তোমাদের আমি খুব মিস করি। ভালো থেকো।

Yours,

David...'

ডেভিডের মেইলটা পড়ে আমিও চমকে গেলাম। কী রকম ঝরঝরে হাতে বাংলা লিখল সে।

সাজিদ বলল–'তাকে এই ব্যাপারে মেইল করছি।'

সাজিদের মেইল লেখা শেষ। কিন্তু মেইলটা দেখার আমারও খুব লোভ হচ্ছিল। তাই আমি সাজিদকে বললাম–'সরে দাঁড়া একটু। আমি দেখি।'

–'কী দেখবি?', সাজিদ জানতে চাইল।

–'কেন? যা লিখেছিস, তা-ই।'

–'কেন দেখবি?'

আমি কটাক্ষ করে বললাম–'স্যার, আপনার লিখার হাত খুব কাঁচা। আপনি যে-বানানে লিখেন, তা পড়ে সদ্য বাংলা শেখা ডেভিডও হাসতে হাসতে খুন হবে। তাই, অ্যাজ ইওর ফ্রেন্ড, লেখাটার প্রুফ রিডিং করে দেওয়া আমার কর্তব্য। আমার প্রিয় বন্ধুর ভুল বানান দেখে সুদূর আমেরিকায় কেউ হাসাহাসি করবে, ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারব না।' অনেকটা মনমরা, কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম।

সাজিদ আমার দিকে তাকিয়ে, মুখ ভেংচিয়ে উঠে পড়ল। আমি ধপাস করে বসে পড়লাম তার চেয়ারে। এরপর লেখাটি ওপেন করলাম। সে যেভাবে লিখেছে, ঠিক সেভাবে পড়া শুরু করলাম –

ডেভিড,

আজ প্রথম তোমায় বাংলাতে লিখছি। কখনো তোমায় বাংলায় লিখব, এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তুমি বাংলা শিখেছ, এটা আমার জন্য সত্যিই অনেক বড় সারপ্রাইজ। রিয়েলি, আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ ডিয়ার।

যাহোক, ধর্মের প্রতি তোমার আগ্রহ আরো একবার আমাকে বিমুগ্ধ করেছে বন্ধু। তুমি আমার কাছে যিশু (যিনি আমাদের ধর্মে ঈসা আলাইহিস-সালাম নামে পরিচিত) সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। জানতে চেয়েছ তাঁর অস্তিত্বের ঐতিহাসিক সত্যতা। কেবল তোমার ধর্মের নয়, আমার ধর্মেরও অন্যতম রাসূল হিসেবে আমারও উচিত এই বিষয়টা পরিষ্কার করা।

তবে তার আগে তোমাকে আমার ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে দুটো কথা বলে নিই।

উনার ব্যাপারে তোমার ধর্মের বিশ্বাস হলো–

এক: যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি নিজে 'তিন ঈশ্বর'-এর একজন।

দুই: উনাকে ইহুদিরা ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলেছে এবং তিনি মৃত অবস্থা থেকে আবার জীবিত হন।

আমার ধর্মবিশ্বাস তোমার এই দুটো বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার ধর্মবিশ্বাস হলো–

এক: উনি আল্লাহর পুত্র নন। আল্লাহর না কোনো সন্তান আছে, না কেউ আল্লাহকে জন্ম দিয়েছে।

দুই: উনাকে মোটেও ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। যখনি ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য জনৈক ইহুদি উনার ঘরে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ তাঁর কুদরতে উনাকে চতুর্থ আসমানে তুলে নেন এবং যে-লোক উনাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে ঘরে প্রবেশ করে, আল্লাহ ঐ লোকের চেহারাকে অবিকল ঈসা (আঃ)-এর মতো করে দেন। ফলে, উনাকে হত্যা করতে আসা ইহুদিরা বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং তারা তাদেরই লোককে ঈসা (আঃ) ভেবে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। কাজেই ঈসা (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হননি।

এটা আমাদের কোরআনের সাক্ষ্য; আর এটাই আমাদের বিশ্বাস। সে যাহোক, তোমাকে যিশু খ্রিষ্ট, আই মিন ঈসা (আঃ)-এর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে নন-ক্রিস্টিয়ান সোর্স থেকে বলতে গেলে আমাকে উনার 'ক্রুশবিদ্ধ' হওয়া ব্যাপারটাকেও সামনে আনতে হবে। অর্থাৎ, আমার বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমার এবং ইহুদিদের বিশ্বাসের সাথে মিলিয়ে আমাকে দেখাতে হবে যে, যিশু খ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। এটা আমি করব কেবল উনার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ণয়ে। জেনে রেখো: এটা আমার বিশ্বাস নয়।

এবার প্রসঙ্গে আসি। ইসলামিক সোর্স এবং ক্রিস্টিয়ান সোর্সের বাইরে গিয়েও আসলে ঈসা (আঃ)-এর অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়।

ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পর থেকে একটি নতুন নামে ক্যালেন্ডার ইয়ারের সময় হিসাব করা হয়। উনার জন্মের আগের সময়কে ধরা হয় 'B.C' হিসেবে। 'B.C' মানে 'Before Christ'। উনার জন্মের আগের সময়টাকে 'Before Christ' নামে ধরা হতো। উনার জন্মের পরে 'Before Christ' বা 'B.C' এর বদলে চালু হয় 'A.D' বা 'Anno Domini'। এই 'Anno Domini' শব্দদ্বয় 'Medieval Latin' থেকে এসেছে যার অর্থ–'In the time of our Lord'। এটার সোজা বাংলা হলো 'ঈসা আঃ-এর সময়কাল হতে।' অর্থাৎ, উনার জন্মের পর থেকে সময়টা 'In the time of our Lord' বা 'Medieval Latin' অনুযায়ী 'A.D' হিসেবে ধরা হয়।

এখন আমাদের দেখতে হবে, এই 'A.D' টাইম স্কেলের শুরুর দিকের এমন কোনো সোর্স আছে কিনা যা ঈসা (আঃ)-এর অস্তিত্বের ব্যাপারে আমাদের কোনো ইঙ্গিত দিতে পারে? হ্যাঁ, ইঙ্গিত আছে।

ইতিহাস থেকে আমরা রোমান সম্রাট 'নিরো'-র ব্যাপারে জানতে পারি। নিরো ছিলেন পঞ্চম রোমান সম্রাট। উনার রাজত্বকাল স্থায়ী হয়েছিল ৫৪ 'A.D' থেকে ৬৮ 'A.D' পর্যন্ত। তাহলে বুঝাই যাচ্ছে উনি যিশুর জন্মের ৫৪-৬৮ বছরের মধ্যকার সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। উনার সময়ে একবার রোম শহরে ভয়ঙ্কর আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই আগুনে রোম শহরের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই আগুনের খবর ইতিহাস বিখ্যাত। তখন 'খ্রিষ্ট ধর্ম' একেবারে শুরুর পর্যায়ে এবং রোমে তখন ছিল ইহুদিদের বসবাস। তথাপি, রোমে ছন্নছাড়া অবস্থায় কিছু খ্রিষ্টান বসবাস করত বলে জানা যায়। খ্রিষ্টানরা তখন রোমে একেবারে নগণ্য হলেও তাদের ব্যাপারে ইহুদিরা সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ, খ্রিষ্টানরা কোনো ইশ্বরের পূজো করে, তাদের ধর্ম কোথায়, কীভাবে উৎপত্তি লাভ করে ইত্যাদি ব্যাপারে ইহুদিরা ওয়াকিবহাল ছিল। রোমের সেই ঐতিহাসিক দাবানলের জন্য তখন রোমবাসীরা সম্রাট নিরোকেই দোষারোপ করে। কিন্তু সম্রাট নিরো নিজের ঘাড়ে দোষ না নিয়ে এই দোষ রোমের সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানদের উপর চাপিয়ে দেয়। সম্রাট নিরোর সময়কালের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ছিলেন Senator Tacitus। তিনি তার সবচেয়ে সফল বই 'Annals'-এ এই আগুন এবং নিরোর প্রতি অভিযোগের চিত্র তুলে ধরেন এভাবে–

'Nero fastened the guilt... on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of... Pontius Pilatus...'

Tacitus এই মন্তব্য করেছিল যিশুর জন্মের ৫০ বছরের মধ্যেই এবং তিনি সুস্পষ্টরূপে তিনটি ব্যাপার এখানে তুলে ধরেছেন–

একঃ নিরো তার উপর আরোপিত দোষ এমন কিছু লোকের উপর চাপিয়ে দিল যারা 'Christian' নামে পরিচিত।

দুইঃ এই 'Christian' নামটি এসেছে 'Christus' নামক কোনো এক ব্যক্তি থেকে। 'Christus' একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ 'Christ'।

তিনঃ এই Christ নামের ব্যক্তিকে 'Extrme Penalty' বা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

চারঃ এই ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় রাজা Tiberius-এর সময়কালে যা বাইবেলে উল্লিখিত যিশু খ্রিষ্টের জন্ম সালের সাথে ম্যাচ করে।

Tacitus কোনো খ্রিষ্টান ছিলেন না। তিনি ছিলেন Jews বা ইহুদি। তিনি তার এই ঐতিহাসিক বইতে রোমান সম্রাট নিরোর সময়কালের আগুন লাগার ব্যাপারটা তুলে ধরতে গিয়ে যিশু তথা ঈসা (আঃ) এবং তাঁর নামানুসারে প্রচলিত হওয়া ধর্মের ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন। এখান থেকেই আমরা সুস্পষ্টরূপে বলতে পারি যে, যিশু তথা ঈসা (আঃ) কোনো Mythical Figure নন, তিনি Historical Figure.

খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদ 'Edwin Yamauchi' Tacitus এর এই উদ্ধৃতিকে যিশু খ্রিষ্টের অস্তিত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, নির্ভরশীল নন-ক্রিস্টিয়ান সোর্স বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন এভাবে–'Probably the most important reference to Jesus outside the New Testaments.'

আরও একজন রোমান সম্রাটের সময়কাল থেকে যিশু খ্রিষ্টের অস্তিত্বের ব্যাপারে জানা যায়। তিনি হলেন Pliny the Younger। বর্তমান তুরস্ক তখন রোমান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। সেখানকার (বর্তমান তুরস্কের) রাজ্য পরিচালনা করছিলেন তখন Pliny the Younger.

সময় তখন ১১২ A.D। তখন মূল রোমান সম্রাট ছিল সম্রাট Trajan। সম্রাট Trajan-কে সম্রাট Pliny একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে খ্রিষ্টান এবং যিশু খ্রিষ্টের ব্যাপারে উল্লেখ পাওয়া যায়। চিঠিতে তিনি লিখেন–

'They were in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light, when they sang in alternate verses a hymn to Christ, as to a god, and bound themselves by a solemn oath, not to any wicked deeds, but never to commit any fraud, theft or adultery, never to falsify their word, nor deny a trust when they should be called upon to deliver it up; after which it was their

custom to separate, and then reassemble to partake of food – but food of an ordinary and innocent kind.'

Pliny-র চিঠি থেকে কিছু স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে।

এক: খ্রিষ্টানরা নির্দিষ্ট একটা দিনে প্রার্থনার জন্য একত্রিত হতো।

দুই: লক্ষণীয় ব্যাপার, বলা হচ্ছে তারা Christ নামের এক ব্যক্তির প্রার্থনা করে যাকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে 'As to God' হিসেবে। এখান থেকে স্পষ্ট, Christ এমন একজন, যিনি মানুষ ছিলেন, একই সাথে ঈশ্বরও (যেহেতু খ্রিষ্টানরা যিশুকে ঈশ্বর জ্ঞান করত)।

Pliny-র এই চিঠি থেকে ১১২ A.D এর দিকে আমরা যিশু খ্রিষ্টের অস্তিত্বের ব্যাপারে জানতে পারি, যা যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ১০০ বছরের মধ্যে লেখা হয়।

তাছাড়াও, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে Josephus নামের এক ইহুদির লেখা 'Jewish Antiquities' নামের বইতেও যিশু খ্রিষ্টের ব্যাপারে উল্লেখ পাওয়া যায়।

তিনি তাঁর বই 'Jewish Antiquities' এ লিখেছেন–'About this time, there lived Jessus, a wise man.'

খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে, Lucian নামের একজন খ্রিষ্ট ধর্মের সমালোচক, যিনি একজন Jewish ছিলেন, তিনি খ্রিষ্টানদের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেন–

'The Christians... worship a man to this day–the distinguished personage who introduced their novel rites, and was crucified on that account... [It] was impressed on them by their original lawgiver that they are all brothers, from the moment that they are converted, and deny the gods of Greece, and worship the crucified sage, and live after his laws.'

Lucian স্পষ্টই বলেছেন, খ্রিষ্টানরা এমন একজনকে ঈশ্বর জ্ঞান করছে যে কিছু মহৎ বাক্য দিয়ে তাদের মোহিত করেছে এবং পরে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে। এখান থেকেই আমরা খ্রিষ্টীয় শতকের প্রথম দিক থেকেই যিশু খ্রিষ্ট তথা ঈসা (আঃ)-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি যে কোনো 'কাল্পনিক' ফিগার নন–বরং 'ঐতিহাসিক' ফিগার, তা প্রমাণের জন্য এসবই যথেষ্ট। যারা বলে যিশু তথা ঈসা (আঃ) একজন 'Mythical Figure', তাদের কাছে দাবির সপক্ষে কিছু গালগল্প ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নেই।

ও হ্যাঁ, ডেভিড, যারা তোমাকে বলেছে যিশু একজন 'Mythical Figure', আই মিন তোমার এথেইস্ট বন্ধুরা, তারা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত এথেইস্ট রিচার্ড ডকিন্সের কথাকে দৈববাণীর মতো বিশ্বাস করে, তাই না?

মজার ব্যাপার কি জানো? এই রিচার্ড ডকিন্সও John Lennox-এর সাথে এক বিতর্কে স্বীকার করেছে যিশু খ্রিষ্ট একজন Historical Figure. তিনি বলেন–'I think, Jesus existed'

আমি মনে করি, নাস্তিকদের যিশু তথা ঈসা (আঃ)-এর অস্তিত্বের ব্যাপারে নাস্তিকদের জবাব দেওয়ার জন্য রিচার্ড ডকিন্সের এই উদ্ধৃতিটিই এনাফ।

আমাকে নিয়মিত লিখবে। আর, তুমিও আবার বেরাতে এসো। আর হ্যাঁ, বাংলা রপ্ত করার জন্য আবারও তোমায় অভিনন্দন বন্ধু। ভালো থেকো।

তোমার প্রিয়

সাজিদ

মেইল পুরোটা পড়লাম। ইতোমধ্যেই সাজিদ গোসল শেষ করে এসে গেছে। আমার পাশে এসে বলল: কি রে, আমেরিকায় বেড়াতে যাবি?'

আমি কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে বলল: 'কী হলো তোর?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, ডেভিড কি এখনো 'তোমাকে' বলে নাকি 'টোমাকে' বলে জানিস?'

সাজিদ হা হা হা করে হেসে উঠল। অনেকদিন পর তাকে আমি এভাবে হাসতে দেখলাম।

**রেফারেন্স :**


- Edwin Yamauchi, quoted in Lee Strobel, The Case for Christ (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1998)
- Tacitus, Annals 15.44, cited in Strobel, The Case for Christ,
- N.D. Anderson, Christianity: The Witness of History (London: Tyndale, 1969), 19, cited in Gary R. Habermas
- The Historical Jesus (Joplin, Missouri: College Press Publishing Company, 1996, 189Ñ190.
- Edwin Yamauchi, cited in Strobel,
- The Case for Christ, 82.
- Pliny, Epistles x. 96, cited in Bruce,

- Christian Origins, 25; Habermas, The Historical Jesus, 198.
- Pliny, Letters, transl. by William Melmoth, rev. by W.M.L. Hutchinson (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1935), vol. II, X:96, cited in Habermas
- The Historical Jesus, Page 199
- M. Harris, "References to Jesus in Early Classical Authors, in Gospel Perspectives V, 354-55, cited in E. Yamauchi,
- 'Jesus Outside the New Testament: What is the Evidence?,' in
- Jesus Under Fire, ed. by Michael J. Wilkins and J.P. Moreland (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1995), p. 227, note 66.
- Habermas, The Historical Jesus, 199.
- Bruce, Christian Origins, 28.
- Josephus, Antiquities xx. 200 , Cited in Bruce, Christian Origins, 36.
- Yamauchi-Jesus Outside the New Testament' Page 212.
- 'Josephus, Antiquities 18.63-64, cited in Yamauchi-Jesus Outside the New Testament', Page 212.

# কোরআন, আকাশ, ছাদ এবং একজন ব্যক্তির মিথ্যাচার

মফিজুর রহমান স্যার সাজিদের দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাকানোর ভঙ্গি এরকম–'বাছা! আজকে তোমাকে পেয়েছি! আজ তোমার বারোটা না বাজাতে পারলে আমার নামও মফিজ না।'

সাজিদ মাথা নিচু করে ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ মিনিট দেরি করে ফেলেছে ক্লাসে আসতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ মিনিট দেরি করে ক্লাসে আসা এমন কোনো গুরুতর পাপ কাজ নয় যে এর জন্য তার দিকে এভাবে তাকাতে হবে।

সাজিদ সবিনয়ে বলল–'স্যার, আসব?'

মফিজুর রহমান স্যার অত্যন্ত গুরু গম্ভীর গলায় বললেন–'হু।'

এমনভাবে বললেন, যেন সাজিদকে দু-চার কথা শুনিয়ে দরজা থেকে খেদিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারলেই উনার গা জুড়োয়।

সাজিদ ক্লাসরুমে এসে বসল। লেকচারের বেশ অর্ধেকটা শেষ হয়ে গেছে। মফিজুর রহমান স্যার আর পাঁচ মিনিট লেকচার দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করলেন।

সাজিদের কপালে যে আজ খুবই খারাপ কিছু আছে সেটা সে প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছে।

মফিজুর রহমান স্যার সাজিদকে দাঁড় করালেন।

খুব স্বাভাবিক চেহারায়, হাসি হাসি মুখ করে বললেন–'সাজিদ, কেমন আছো?'

সাজিদ প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এই মুহূর্তে সে যদি সত্যি সত্যিই ডুমুরের ফুল অথবা ঘোড়ার ডিম জাতীয় কিছু দেখত, হয়তো এতটা চমকাত না। মিরাকল জিনিসটায় তার বিশ্বাস আছে, তবে মফিজুর রহমান স্যারের এই আচরণ তার কাছে তার চেয়েও বেশি কিছু মনে হচ্ছে।

এই ভদ্রলোক এত সুন্দর করে, এরকম হাসিমুখ নিয়ে কারও সাথে কথা বলতে পারে, এটাই এতদিন একটা রহস্য ছিল।

সাজিদ নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বলল–'জ্বি স্যার, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ্। আপনি কেমন আছেন?'

তিনি আবারও একটি মুচকি হাসি দিলেন। সাজিদ পুনরায় অবাক হলো। মনে হচ্ছে সে কোনো দিবাস্বপ্নে বিভোর আছে।

স্বপ্নের একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে, স্বপ্নে বেশিরভাগ সময় নেগেটিভ জিনিসকে পজিটিভ আর পজিটিভ জিনিসকে নেগেটিভ ভাবে দেখা যায়। মফিজুর রহমান স্যারকে নিয়ে তার মাত্রাতিরিক্ত নেগেটিভ চিন্তা থেকেই হয়তো এরকম হচ্ছে। একটু পরে সে হয়তো দেখবে, এই ভদ্রলোক তার দিকে রাগিরাগি চেহারায় তাকিয়ে আছে এবং বলছে–'অ্যাই ছেলে? এত দেরি করে ক্লাসে কেন এসেছ? তুমি জানো আমি তোমার নামে ডিন স্যারের কাছে কমপ্লেইন করে দিতে পারি? আর কোনোদিন যদি দেরি করেছ...'

সাজিদের চিন্তায় ছেদ পড়ল। তার সামনে দাঁড়ানো হালকা-পাতলা গড়নের মফিজুর রহমান নামের ভদ্রলোকটি বললেন–'আমিও খুব ভালো আছি।'

ভদ্রলোকের মুখে হাসির রেখাটা তখনও স্পষ্ট।

মফিজুর রহমান স্যার সাজিদকে বললেন–'আচ্ছা বাবা আইনস্টাইন, তুমি কি বিশ্বাস করো আকাশ বলে কিছু আছে?'

সাজিদ এবার নিশ্চিত হলো যে, এটা কোনো স্বপ্নদৃশ্য নয়। মফিজুর রহমান স্যার তাচ্ছিল্যভরে সাজিদকে 'আইনস্টাইন' বলে ডাকে। সাজিদকে যখন আইনস্টাইন বলে, তখন ক্লাসের অনেকে খিলখিল করে হেসে উঠে। এই মুহূর্তে সাজিদ একটি চাপা হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তাহলে এটা কোনো স্বপ্নদৃশ্য নয়। বাস্তব।

সাজিদ বলল–'জ্বি স্যার, বিশ্বাস করি।'

ভদ্রলোক আরেকটি মুচকি হাসি দিলেন। উনি আজকে হাসতে হাসতে দিন কেটে পার করে দেওয়ার পণ করেছেন কিনা কে জানে।

তিনি বললেন–'বাবা আইনস্টাইন, আদতে আকাশ বলে কিছুই নেই। আমরা যেটাকে আকাশ বলি, সেটা হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির প্রান্তসীমা। মাথার উপরে নীলরঙা যে-জিনিস দেখতে পাও, সেটাকে মূলত বায়ুমণ্ডলের কারণেই নীল দেখায়। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই বলে চাঁদে আকাশকে কালো দেখায়। বুঝতে পেরেছেন মহামতি আইনস্টাইন?'

স্যারের কথা শুনে ক্লাসের কিছু অংশ আবার হাসাহাসি শুরু করল।

স্যার আবার বললেন–'তাহলে বুঝলে তো আকাশ বলে যে কিছুই নেই?'

সাজিদ কিছুই বলল না। চুপ করে আছে।

স্যার বললেন–'গতরাতে হয়েছে কি জানো? নেট সার্চ দিয়ে একটি ব্লগ সাইটের ঠিকানা পেলাম। মুক্তমনা ব্লগ নামে। রবিজিৎ নামে এক ব্লগারের লেখা পেলাম সেখানে। খুব ভালো লেখে দেখলাম। যাহোক, রবিজিৎ নামের এই লোকটা কোরআনের কিছু বাণী উদ্ধৃত করে দেখাল কত উদ্ভট এসব জিনিস। সেখানে আকাশ নিয়ে কী বলা আছে শুনতে চাও?'

সাজিদ এবারও কিছু বলল না। চুপ করে আছে।

স্যার বললেন, কোরআনে বলা আছে–

'আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। অথচ, তারা আমাদের নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।'

'And we made the sky a protected ceiling, but they, from its signs, are turning away. Al-Ambia: 32'

দেখলে তো বাবা আইনস্টাইন, তোমাদের আল্লাহ্ বলেছে, আকাশ নাকি সুরক্ষিত ছাদ। তা বাবা, এই ছাদে যাবার কোনো সিঁড়ির সন্ধান কোরআনে আছে কি? হা হা হা হা।'

চুপ করে থাকতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু লোকটির মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে সাজিদ মুখ খুলতে বাধ্য হলো।

সে বলল–'স্যার, আপনার সেই ব্লগার রবিজিৎ আর আপনার প্রথম ভুল হচ্ছে, আকাশ নিয়ে আপনাদের দুজনের ধারণা মোটেও পরিষ্কার নয়।'

–'ও, তাই নাকি? তা আকাশ নিয়ে পরিষ্কার ধারণাটি কি বলো শুনি?', অবজ্ঞা ভরে লোকটির প্রশ্ন।

সাজিদ বলল–'স্যার, আকাশ নিয়ে ইংরেজি অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা আছে, 'The region of the atmosphere and outer space seen from the earth', অর্থাৎ, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বায়ুণ্ডলের এবং তার বাইরে যা কিছু দেখা যায়, সেটাই আকাশ।

আকাশ নিয়ে আরও পরিষ্কার বলা আছে উইকিপিডিয়াতে; যদিও উইকপিডিয়ার তথ্য মূল সোর্স নয়। আপনি নেট ঘেঁটে মুক্তমনা ব্লগ অবধি যেতে পেরেছেন, আরেকটু এগিয়ে উইকিপিডিয়া অবধি গেলেই পারতেন। যাহোক, আকাশ নিয়ে উইকিপিডিয়াতে বলা আছে–'The sky (or celestial dome) is everything that lies above the surface of the Earth, including the atmosphere and outer space' অর্থাৎ, পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের উপরে যা কিছু আছে, তার সবই আকাশের অন্তর্গত। এর মধ্যে বায়ুমণ্ডল এবং তার বাইরের সবকিছুও আকাশের মধ্যে পড়ে।'

–'হু, তো?'

–'এটা হচ্ছে আকাশের সাধারণ ধারণা। এখন আপনার সেই আয়াতে ফিরে আসি।'

'আপনি কোরআন থেকে উল্লেখ করেছেন–

'আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। অথচ, তারা আমাদের নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।'

'আপনি বলেছেন, আকাশ কীভাবে ছাদ হয়, তাই না?

'স্যার, বিংশ শতাব্দীতে বসে বিজ্ঞান জানা কিছু লোক যদি এরকম প্রশ্ন করে, তাহলে আমাদের উচিত বিজ্ঞান চর্চা বাদ দিয়ে গুহার জীবনযাপনে ফিরে যাওয়া।'

–'What do you mean?'

–'বলছি স্যার। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর উপরিভাগে যে-বায়ুমণ্ডল আছে, তাতে কিছু স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এসব পুরু স্তর দ্বারা গঠিত। এই স্তরগুলো হচ্ছে:

এক: ট্রপোস্ফিয়ার

দুই: স্ট্রাটোস্ফিয়ার

তিন: মেসোস্ফিয়ার

চার: থার্মোস্ফিয়ার

পাঁচ: এক্সোস্ফিয়ার।

'এই প্রত্যেকটি স্তরের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। আপনি কি জানেন, বিজ্ঞানী Sir Venn Allen প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, আমাদের পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের চারদিকে একটি শক্তিশালী Magnetic Field আছে। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠের চারদিকে একটি বেল্টের মতো বলয় সৃষ্টি করে রেখেছে। বিজ্ঞানী স্যার Venn Allen-এর নামে এ জিনিসটার নাম রাখা হয় Venn Allen Belt.

'এই বেল্ট চারপাশে ঘিরে রেখেছে আমাদের বায়ুমণ্ডলকে। আমাদের বায়ুমন্ডলের দ্বিতীয় স্তরটির নাম হচ্ছে 'স্ট্রাটোস্ফিয়ার।' এই স্তরের মধ্যে আছে এক জাদুকরি উপস্তর। এই উপস্তরের নাম হলো ওজোন স্তর।'

'এই ওজোন স্তরের কাজের কথায় পরে আসছি। আগে একটু সূর্যের কথা বলি। সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে যে-বিস্ফোরণগুলো হয়, তা আমাদের চিন্তা-কল্পনারও বাইরে। এই বিস্ফোরণগুলোর ক্ষুদ্র একটি বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তা এমন যে, তা জাপানের হিরোশিমায় যে-অ্যাটমিক বোমা ফেলা হয়েছিল, সেরকম দশ হাজার বিলিয়ন অ্যাটমিক বোমার সমান। চিন্তা করুন স্যার, সেই বিস্ফোরণগুলোর একটু আঁচ যদি পৃথিবীতে লাগে, পৃথিবীর কী অবস্থা হতে পারে?

'এখানেই শেষ নয়। মহাকাশে প্রতি সেকেন্ডে নিক্ষিপ্ত হয় মারাত্মক তেজস্ক্রিয় উল্কাপিণ্ড। এগুলোর একটি আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে পৃথিবী।

'আপনি জানেন আমাদের এই পৃথিবীকে এরকম বিপদের হাত থেকে কোনো জিনিসটা রক্ষা করে? সেটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। আরও স্পেসিফিকলি বলতে গেলে বলতে হয়, ওজোন স্তর।'

'শুধু তাই নয়, সূর্য থেকে যে-ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি আর গামা রশ্মি পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে, সেগুলো যদি পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারত, তাহলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারত না। এই অতিবেগুনি রশ্মির ফলে মানুষের শরীরে দেখা দিত চর্ম ক্যান্সার। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ হতো না। আপনি জানেন, সূর্য থেকে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসা এসব ক্ষতিকর জিনিসকে কোন জিনিসটা আটকে দেয়? পৃথিবীতে ঢুকতে দেয় না? সেটা হলো বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর। এই ওজোন স্তর এসব ক্ষতিকর উপাদানকে স্ক্যানিং করে পৃথিবীতে প্রবেশে বাধা দেয়।

'মজার ব্যাপার কি জানেন? এই ওজোন স্তর সূর্য থেকে আসা কেবল সেসব উপাদানকেই পৃথিবীতে প্রবেশ করতে দেয়, যেগুলো পৃথিবীতে প্রাণের জন্য সহায়ক। যেমন, বেতার তরঙ্গ আর সূর্যের উপকারী রশ্মি। এখানেই শেষ নয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যে-তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়, তার সবটাই যদি মহাকাশে বিলীন হয়ে যেত, তাহলে রাতের বেলা পুরো পৃথিবী ঠাণ্ডা বরফে পরিণত হয়ে যেত। মানুষ আর উদ্ভিদ বাঁচতেই পারত না। কিন্তু, ওজোন স্তর সব কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে মহাকাশে ফিরে যেতে দেয় না। কিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে সে ধরে রাখে যাতে পৃথিবী তাপ হারিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা বরফ শীতল না হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা এটাকে গ্রিন হাউজ বলে।

'স্যার, বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের এই যে ফর্মুলা, কাজ, এটা কি আমাদের পৃথিবীকে সূর্যের বিস্ফোরিত গ্যাস, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি, মহাকাশীয় উল্কাপিণ্ড থেকে 'ছাদ'-এর মতো রক্ষা করছে না? আপনার বাসায় বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে পারে না আপনার বাসার ছাদের জন্য। বিভিন্ন দুর্যোগে আপনার বাসার ছাদ যেমন আপনাকে রক্ষা করছে, ঠিক সেভাবে বায়ুমণ্ডলের এই ওজোন স্তর কি আমাদের পৃথিবীকে রক্ষা করছে না?

'আমরা আকাশের সংজ্ঞা থেকে জানলাম যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে উপরের সবকিছুই আকাশের মধ্যে পড়ে। বায়ুমণ্ডলও তো তাহলে আকাশের মধ্যে পড়ে এবং আকাশের সংজ্ঞায় বায়ুমণ্ডলের কথা আলাদা করেই বলা আছে।

'তাহলে বায়ুমণ্ডলের এই যে আশ্চর্য রকম 'প্রটেক্টিং পাওয়ার', এটার উল্লেখ করে যদি আল্লাহ্ বলেন–

'আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। অথচ, তারা আমাদের নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।'

'তাহলে স্যার ভুলটা কোথায় বলেছে? বিজ্ঞান তো নিজেই বলছে, বায়ুমণ্ডল, স্পেশালি বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর একটি ছাদের ন্যায় পৃথিবীকে রক্ষা করছে। তাহলে আল্লাহ্ও যদি একই কথা বলে, তাহলে সেটা অবৈজ্ঞানিক হবে কেন?

'আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আপনার সেই রবিজিৎ রায় বিজ্ঞান কম বুঝেন সম্ভবত। উনাদের কাজ সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকার পরও মনগড়া কথা লিখে কোরআনের ভুল ধরা।'

কথাগুলো বলে সাজিদ থামল। পুরো ক্লাসে সে এতক্ষণ ধরে একটা লেকচার দিয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে। তাকে আইনস্টাইন বলায় যারা খলখল করে হাসত, তাদের চেহারাগুলো হয়েছে দেখার মতো।

মফিজুর রহমান স্যার কিছুই বললেন না। 'See you next' বলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন সেদিন।

# আয়িশা (রাঃ) ও মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিয়ে এবং কথিত নাস্তিকদের কানাঘুষা

আমরা চারজন বসে টিএসসি তে আড্ডা দিচ্ছিলাম। রাকিব, শাহরিয়ার, সাজিদ আর আমি।

আমাদের মধ্যে শাহরিয়ার হলো খেলাপ্রেমিক। ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনার চরম ভক্ত। কেউ পুরো সপ্তাহে কোনো ম্যাচ না দেখে শাহরিয়ারের কাছে আধঘণ্টা বসলেই হবে। শাহরিয়ার পুরো সপ্তাহের খেলার আদ্যোপান্ত তাকে কাগজে-কলমে বুঝিয়ে দেবে। ইপিএলে কোন দল টপে আছে, ম্যানচেস্টার সিটির দায়িত্ব নিয়ে পেপ গার্দিওলা কী রকম দলটাকে পাল্টে দিল, সিরি আ-তে জুভের অবস্থান কোথায়, ইব্রাকে ছেড়ে দিয়ে ফ্রেঞ্চলিগে পিএসজির অবস্থা কেমন, বুন্দেসলিগাতে বায়ার্ন আর ডর্টমুন্ড কী করছে, লা লিগাতে বার্সা-রিয়ালের দৌড়ে কে এগিয়ে, রোনালদোর ফর্ম নেই কেন, মেসিকে ছাড়া বার্সা সামনের ম্যাচগুলা উতরে যেতে পারবে কি না, নেইমার সেরা না বেল, সুয়ারেজ নাকি বেনজেমা ইত্যাদি ইত্যাদি বিশ্লেষণের জন্য শাহরিয়ারের জুড়ি নেই। এত কঠিন কঠিন স্প্যানিশ, জার্মেইন, ফ্রেঞ্চ আর ইতালির নামগুলো সে কীভাবে যে মনে রাখে আল্লাহ্ মালুম। খেলার খবর বলতে শুরু করলে তার আর থামাথামি নেই। ননস্টপ বলে যেতে পারে। এজন্যে আমাদের বন্ধুমহলে শাহরিয়ার 'স্পোর্টস চ্যানেল' নামে পরিচিত।

রাকিব হলো আগাগোড়া 'পলিটিক্স স্পেশালিস্ট'।

দুনিয়ার রাজনীতি কখন কোথায় কীভাবে মোড় নিচ্ছে তার সমস্ত রকম আপডেট থাকে রাকিবের কাছে। গুলির মুখ থেকে ট্রাম্পের বেঁচে আসা থেকে শুরু করে হিলারির ম্যালেরিয়া পর্যন্ত সব খবর তার নখদর্পণে। তবে, ইদানিং সে ব্যস্ত 'পাক–ভারত' যুদ্ধ নিয়ে। কাশ্মীরের উরিতে হামলা নিয়ে পাক-ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব বিরাজ করছে, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেই যাচ্ছে সে। রাকিব মনে করছে, উরির হামলাটা আসলে ভারতের একটি 'ব্লাইন্ড গেম'। এটা নিয়ে চলমান ব্রিফিঙের মাঝখানে হঠাৎ নিলয়দার আগমন। নিলয়দা আমাদের চেয়ে সিনিয়র মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র।

আমাদের চেয়ে ঢের সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সাথে তার বন্ধুত্বসুলভ আচরণ দেখে বোঝার উপায় নেই যে, নিলয়দা এত সিনিয়র লেভেলের কেউ।

তার হাতে একটি পত্রিকা। পত্রিকা হাতে নিলয়দা আমাদের পাশে এসে বেঞ্চে বসল।

নিলয়দাকে দেখে সাজিদ আরেক কাপ রঙ চা-র অর্ডার করল।

চা চলে এলে নিলয়দা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল–'বাকস্বাধীনতার মূল্য পৃথিবীর কোত্থাও নেই, বুঝলি? কোত্থাও নেই।'

কথাগুলো এমনভাবে বলল যে, নিলয়দাকে খুব মর্মাহত দেখাল। নিলয়দা কোন পয়েন্ট থেকে কথাগুলো বলল তা আমাদের কারও মাথাতে আসেনি তখনও। রাকিব বলে উঠল–'নিলয়দা কি পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় কটূক্তির দায়ে গ্রেফতার হওয়া জনৈক ব্যক্তির কথা বললেন?'

নিলয়দা রাকিবের কথার প্রত্যুত্তরে কোনকিছু বলল না। তার মানে রাকিবের ধারণা ঠিক। অন্য সময় হলে রাকিবের এরকম উপস্থিত বুদ্ধির বহর দেখে নিলয়দা তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলত 'সাবাশ'। কিন্তু আজ খুব ফ্রাস্টেটেড থাকায় নিলয়দা খুব অফ মুডে আছে বলে মনে হচ্ছে।

ব্যাপারটা খুব শর্টলি ব্যাখ্যা করল রাকিব। পশ্চিমবঙ্গের এক নাস্তিক তরুণ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে কটূক্তি করার ফলে সাইবার আইনে গ্রেফতার হয়েছে পরশু দিন। এটাকে নিলয়দা বলছে বাকস্বাধীনতার উপর আঘাত।

সাজিদ তার চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বলল–'এতে দোষের তো কিছু দেখছি না দাদা। ছেলেটা দোষ করেছে, সে তার শাস্তি পাচ্ছে। What's wrong?'

নিলয়দা মুখের রং পরিবর্তন করে বড় বড় চোখে সাজিদের দিকে তাকাল। বলল–'একজন পঞ্চাশোর্ধ বুড়া লোক ৯ বছর বয়সী একটা মেয়েকে বিয়ে করলে দোষ নেই, তা নিয়ে কথা বললেই দোষ হয়ে যায়, না?'

সাজিদ বলল–'কথা বললে তো দোষ নেই দাদা, কিন্তু অশ্লীল ভাষায় কটূক্তি করাটা দোষের। একটি ধর্মের পবিত্র নবীকে নিয়ে এরকম খিস্তি করাটা মূল্যবোধ বিরোধী তো বটেই, এটা সংবিধান বিরোধীও।'

–'গোষ্ঠী কিলাই তোমার এরকম মূল্যবোধ আর সংবিধানের।'

সাজিদ বুঝল নিলয়দা খুব ক্ষেপে আছে। তাকে সহজে বোঝানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

সাজিদ বলল–'দাদা, মনে আছে তোমার? আমি তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। তোমার সাথেও প্রথম পরিচয় হয় তখন। এক সন্ধ্যায় হুমায়ূন আহমেদের মেয়ের বয়সী শাওনকে বিয়ে করার ব্যাপারটা নিয়ে যখন আপত্তি

উঠেছিল, তখন তুমি কি বলেছিলে? তুমি বলেছিলে যে, বিয়ে একটি বৈধ সামাজিক বন্ধন। যখন তাতে দুটি পক্ষের সম্মতি থাকে, তখন সেখানে বয়স, সামাজিক স্ট্যাটাস কোনোকিছুই ম্যাটার করে না। আমি হুমায়ূন আহমেদের বিয়ের ব্যাপারটি নিয়ে কনভিন্স। হুমায়ূন আহমেদ শরিয়া ও রাষ্ট্রীয় আইনসম্মত একটি বৈধ কাজ করেছেন। হুমায়ূন আহমেদের বেলায় যে-কথাগুলো প্রযোজ্য, সে-কথাগুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলায় কেন প্রযোজ্য হবে না? এটা ডাবল স্টান্ডার্ড নয়?'

নিলয়দা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। এরপর বলল–'তাই বলে বলতে চাচ্ছিস, ৯ বছরের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ হয়ে যাবে?'

সাজিদ হাসল। বলল–'দাদা, আমি মোটেও তা বলছি না। আমি প্রথমত বোঝাতে চাইলাম যে, বিয়ে একটা সামাজিক বন্ধন।'

–'তো? সামাজিক বন্ধন ধরে রাখতে ৯ বছরের কিশোরী বিয়ে করতে হবে নাকি?'

সাজিদ উঠে দাঁড়াল। আমি জানি এখন সে লেকচার শুরু করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আয়িশা (রাঃ)-এর বিয়ে নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ লেকচার দেওয়ার জন্য সে মেন্টালি প্রস্তুতি নিচ্ছে।

যা ভাবলাম তাই। সাজিদ বলতে শুরু করল–

'দাদা, প্রথমে বলে রাখি, যারাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর আয়িশা (রাঃ)-এর বিয়ে নিয়ে আপত্তি তুলে, তাদের প্রথম দাবি: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকি যৌন লালসায় কাতর ছিলেন। সেজন্যে তিনি নাকি কিশোরী আয়িশা (রাঃ)-কে বিয়ে করেছিলেন।

'তাদের এই দাবি যে কতটা বাতুলতা আর ভিত্তিহীন, তা ইতিহাস থেকে আমরা দেখব। আমরা জানি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করেছিলেন ২৫ বছর বয়সে হজরত খাদিজা (রাঃ)-কে।

'বলাবাহুল্য, যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫ বছরের একজন টগবগে তরুণ, ঠিক সেই সময়ে তিনি বিয়ে করলেন চল্লিশোর্ধ একজন মহিলাকে, যিনি কিনা আবার একজন বিধবা ছিলেন। খাদিজা (রাঃ) যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কোনো বিয়ে করেননি। খাদিজা (রাঃ)-এর গর্ভেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করেছিল। বলো তো দাদা, তোমাদের ভাষায় যিনি একজন যৌনকাতর মানুষ, তিনি কেন তার পুরো যৌবনকাল একজন বয়স্ক, বয়োবৃদ্ধা মহিলার সাথে কাটিয়ে দিলেন?

'তুমি হয়তো বলবে, খাদিজা (রাঃ)-এর প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিল, পাছে এগুলো হারানোর ভয়ে হয়তো তিনি আর বিয়ে করেননি। তোমার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, এটা ইতিহাস সম্মত যে, সম্পদশালী খাদিজা (রাঃ) নিজেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন; মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না। তার উপর, খাদিজা (রাঃ) নিজেই যেখানে একজন বিধবা ছিলেন, সেখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও যদি সেই অবস্থায় আরেকটি বিয়ে করতে চাইতেন, তাতে বাধা দেওয়ার অধিকার খাদিজা (রাঃ)-এর থাকার কথা নয়।

'তাহলে এখান থেকে আমরা কী বুঝলাম? আমরা বুঝলাম যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) যৌনকাতরতা থেকে কিশোরী আয়িশা (রাঃ) কে বিয়ে করেননি।'

নিলয়দা সাজিদের কথার মাঝে প্রশ্ন করল–'তাহলে কিশোরী আয়েশাকে বিয়ে করার হেতু কি?'

সাজিদ বলল–'Let me finish please'। আয়িশা (রাঃ)-কে বিয়ে করার একটা হুকুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কারণ জ্ঞানে-গুণে আয়িশা (রাঃ) ছিলেন তৎকালীন আরব কন্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তার সেই প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বিচক্ষণতা যাতে পুরোপুরিভাবে ইসলামের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা যায়, সেজন্য হয়তো এই হুকুম।'

স্পোর্টস চ্যানেল শাহরিয়ার এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে বলল–'সাজিদ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রাঃ)-কে বিয়ে করার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হুকুমপ্রাপ্ত; এই কথার ভিত্তি কী?'

সাজিদ শাহরিয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল–'নবীদের স্বপ্নও একপ্রকার ওহি, এটা জানিস তো?'

–'হ্যাঁ।'

–'বুখারির হাদিসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আয়িশা (রাঃ)-কে একবার বললেন–'(হে আয়িশা)! আমি তোমাকে দুইবার স্বপ্নে দেখেছিলাম। একটি রেশমের উপরে কার যেন মুখচিহ্ন। আমি যখন রেশমের উপর থেকে আবরণ সরালাম, আমি দেখলাম সেটা তোমার মুখাবয়ব। তখন কেউ একজন আমাকে বলল, '(হে মুহাম্মাদ) এটা তোমার স্ত্রী।' আমি বললাম, যদি এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়, তাহলে এটাই হবে।'

'বুখারির এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আয়িশা (রাঃ) যে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী হবেন, সেটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হুকুমপ্রাপ্ত।'

শাহরিয়ার আবার বলল–'কিন্তু তুই যে বললি, তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইসলামের কল্যাণার্থে ব্যবহারের জন্যই এই হুকুম, তার দলিল কী?'

সাজিদ বলল–'এটা তো সর্বজনবিদিত সত্য কথা। সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পর সবচেয়ে বেশি যিনি হাদিস মুখস্থ করেছিলেন, তিনি হজরত আয়িশা (রাঃ)। শুধু তাই নয়, আয়িশা (রাঃ)-এর ছিল কোরআনের অগাধ পাণ্ডিত্য। এমনকি বড় বড় সাহাবিরা পর্যন্ত তাঁর কাছে ফতোয়ার জন্য আসতেন। তাঁর ফিকহি জ্ঞান অনেক বেশি ছিল। আবু মূসা আল আশআরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন–'এমন কখনো হয়নি (ফিকহি বিষয়ে) আমরা কোনোকিছুর সমাধানের জন্য আয়িশা (রাঃ)-এর কাছে গেলাম কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাইনি।'

'অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ)-এর এই যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা–এর জন্য তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক উম্মুল মুমিনীন হিসেবে সিলেক্টেড হয়ে যান।'

'এছাড়াও, তৎকালীন আরবে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। তখনকার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। এটা ঠিক, যুগের সাথে সাথে সেটা পাল্টিয়েছে। এখন মেয়েদের অনেক চিন্তাঃ ক্যারিয়ার গড়ো, পড়াশোনা করো, বিদেশ যাও, উচ্চ ডিগ্রির সার্টিফিকেট নাও।

'তখন আরবের মেয়েদের চাকরি করার দরকার হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ার রীতিও তখন ছিল না। ঘরোয়া পরিবেশে তারা ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করত। এর জন্য, কম বয়সেই তাদের বিয়ের রীতি ছিল।

'তখন মেয়েদের কম বয়সেই যে বিয়ের রীতি ছিল, তা আয়িশা (রাঃ)-এর জীবনের আরেকটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বিয়ের আগে আয়িশা (রাঃ)-এর আরেকজনের সাথে বিয়ে ঠিক হয়। তার নাম ছিল জুবায়ের। কিন্তু, আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করায় বিয়েটা ভেঙে যায়। এর থেকে কী প্রমাণ হয় না, তখন মেয়েদের কম বয়সেই বিয়ের প্রচলন ছিল? তাছাড়া, তখনকার মক্কার কোনো বিধর্মীরা এই বিয়ে নিয়ে আপত্তি তোলেনি। তারাও জানত, এটা খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। অথচ ইসলাম আর নবীর বিরুদ্ধে ওদের যে-শত্রুতা ছিল, তাতে ওদেরই কিন্তু এটা নিয়ে আগে ঝাপিয়ে পড়ার কথা ছিল।'

নিলয়দা বলল–'মুহাম্মদ তো এসেছিলেন রীতি ভেঙে রীতি গড়ার জন্য। তিনি এই অদ্ভুত রীতি ভাঙলেন না কেন?'

সাজিদ বলল–'দাদা, ঠিক বলেছ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন রীতি ভেঙে রীতি গড়ার জন্য। কিন্তু তিনি সেসব রীতি ভাঙার জন্য

এসেছিলেন, যা অনৈতিক, যেমন কন্যা শিশুকে জীবন্ত দাফন। তিনি আরবের সেসব কালচার পাল্টে দিয়েছেন, যা জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, অল্প বয়সে বিয়ে সেরকম কোনো ব্যাপার নয়। বিজ্ঞান আমাদের বলে, মেয়েরা পুরুষের চেয়ে দশগুণ তাড়াতাড়ি ম্যাচিউরড হয়। সেটা ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি দুভাবেই। তাছাড়া, তখনকার আরবে কম বয়সে বিয়ে হওয়ার পরও মেয়েরা খুব নরমালিই সন্তান জন্ম দিত। এটা কোনো সমস্যা ছিল না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এটা চেঞ্জ করার তো দরকার ছিলই না। যা দরকার ছিল, তা তিনি করেছেন। তুমি কি আশা করছ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন তৎকালীন আরবদের উটের ব্যবসা তুলে দিয়ে তাদের শেয়ার ব্যবসা শেখালেন না, কেন তিনি খেঁজুরের ব্যবসা তুলে দিয়ে সেখানে চকোলেট আর রসমালাইয়ের ব্যবসার প্রচলন করলেন না? তুমি হয়তো ভাবছ, তৎকালীন আরবের বালকদের উট চরানো থেকে মুক্তি দিয়ে কেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের হাতে একটি করে কম্পিউটার এবং একটি করে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে দিলেন না?'

সাজিদের কথা শুনে আমি, রাকিব আর শাহরিয়ার হা হা হা হা করে হাসতে লাগলাম। সাজিদ বলল-'মানুষ মাত্রই তাঁর সমাজের সুষ্ঠু নিয়মগুলোর সাথে মিলিয়ে চলতে বাধ্য। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না দাদা। তাছাড়া, এত অল্প বয়সে বিয়ে কেবল ১৪০০ বছর আগে ছিল তা নয়, শিল্পবিপ্লবের পরেও অনেক উন্নত দেশে বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের সর্বনিম্ন বয়সসীমা ১০-এর নিচে ছিল।

'তাছাড়া, ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরও ৫০০ বছর পরে, ইংল্যান্ডের রাজা জন ৪৪ বছর বয়সে ১২ বছর বয়সী রানী ইসাবেলাকে বিয়ে করেছিলেন। এ ব্যাপারগুলো তখনকার সমাজে, যুগে খুব স্বাভাবিক ছিল, যেমন স্বাভাবিক সঙ্গম করে সন্তান জন্ম দেওয়া। তাছাড়া, উপমহাদেশেও যে খুব ছোট বয়সে বিয়ের একটি রীতি ছিল, তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'হৈমন্তি' থেকেই আমরা দেখতে পাই। লেখক সেখানে দেখিয়েছেন, তখনকার সময়ে ৮ থেকে ১১ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হতো। হৈমন্তির বিয়ের স্বাভাবিক বয়স পেরিয়ে যাওয়ায়, অর্থাৎ, ১৭ হয়ে যাওয়ায় তার শাশুড়ি সেটা সবার কাছ থেকে লুকোতে চাইছিলেন। হৈমন্তিকেও মিথ্যে বলার জন্য শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এখান থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের সময়েও ৮ থেকে ১১ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে ছিল একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

'সেই গল্পে আমরা 'পণপ্রথা'র কুফল সম্পর্কে একটি আভাস পেলেও, কোথাও কিন্তু বিয়ের বয়স নিয়ে উচ্চবাক্য দেখিনি। বরং, হৈমন্তির বয়স বেশি হয়ে যাওয়াতেই

কিছুটা আপত্তি দেখা গেছে। এখান থেকে বুঝতে পারি, রবীন্দ্র আমলেও কম বয়সে বিয়ের একটি প্রচলন ভারতবর্ষেই মজুদ ছিল।'

সাজিদের এই লেকচারে নিলয়দা সন্তুষ্ট হলো না।

'যতই ত্যানা প্যাঁচাও, একজন বয়োবৃদ্ধ লোক একজন ৯ বছর বয়সী কিশোরীকে বিয়ে করেছে, এটাকে তুমি কোনোভাবেই ডিফেন্ড করতে পারো না। সে প্রফেট হোক আর যাই-ই হোক'- নিলয়দা বলল।

আমি ভাবলাম, এইবার সাজিদ পরাজিত হবে। হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ গলায় বলবে–'নাহ! আর পারলাম না দাদা।'

কিন্তু না। সাজিদের মধ্যে আমি তেমন কিছুই দেখলাম না। সে খুব স্বাভাবিক। মুচকি একটি হাসির রেখা তার ঠোঁটে। সে আরেক কাপ চায়ের অর্ডার করল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল–'দাদা, নতুন কমিটিতে পদ পেয়েছ শুনলাম।'

নিলয়দা বলল–'হুম, সাহিত্য সম্পাদক।'

সাজিদ বলল–'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী সম্পর্কে নিশ্চয় অনেক কিছু জানো।'

–'হ্যাঁ। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানি এবং সকলেরই জানা উচিত।'

–'একদম ঠিক। বঙ্গবন্ধু আমাদের আইডল।'

নিলয়দা বলল–'শুধু কি আমাদের আইডল? বঙ্গবন্ধু পুরো বাঙালি জাতির আইডল।'

–'জ্বি, সেটাই দাদা। আমি হৃদয়ের গহীন থেকেই বঙ্গবন্ধুকে ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি। আচ্ছা দাদা, তুমি জানো বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর নাম কী ছিল?'

নিলয়দা অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলল–'কি সব বলছিস তুই? জানব না কেন? বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা বেগম।'

সাজিদ বলল–'দাদা, তুমি জানো, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসার জন্ম কোন সালে?'

নিলয়দা কিছুক্ষণ ভাবলেন। বললেন–'ভুলে গেছি রে! বিসিএসের জন্য যখন প্রিপারেশান নিচ্ছিলাম, তখন পড়েছিলাম।'

সাজিদ তার ফোন বের করে সেখান থেকে গুগলে 'বেগম ফজিলাতুন্নেসা' লিখে সার্চ দিল। রেজাল্ট দেখাল বেগম ফজিলাতুন্নেসার জন্ম ১৯৩০ সালে। সাজিদ সেটা নিলয়দাকে দেখাল।

নিলয়দা বলল–'হুম, মনে পড়েছে। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? হঠাৎ এই ব্যাপারে চলে গেলি কেন?'

সাজিদ বলল–'দাদা, তুমি জানো, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কত সালে বিয়ে হয়?'

নিলয়দা 'না'-সূচক মাথা নাড়ল। সাজিদ আবার উইকি থেকে দেখাল। বঙ্গবন্ধুর সাথে বঙ্গমাতার বিয়ে হয় ১৯৩৮ সালে।

সাজিদ বলল–'দাদা, ১৯৩৮ থেকে ১৯৩০ বাদ দিলে কত থাকে?'

নিলয়দা বলল–'৮...'

সাজিদ বলল–'জ্বি দাদা, একদম ঠিক বলেছ। ১৯৩৮ থেকে ১৯৩০ বাদ দিলে থাকে ৮। ঠিক ৮ বছর বয়সের বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে বঙ্গবন্ধুর বিয়ে হয়। আচ্ছা দাদা, আমি কি এটাকে বাল্যবিবাহ বলতে পারব? এই শরীয়াসম্মত বিয়ের জন্য কি বঙ্গবন্ধুকে ব্লেম করা নৈতিকভাবে ঠিক হবে? নাহ। মোটেই ঠিক হবে না।'

'এখন বলো তো, বিংশ শতাব্দীর বঙ্গবন্ধু যেটা পেরেছেন, ১৪০০ বছর আগের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন পারবে না? কেন তাকে ধর্ষক, যৌনকাতর, যৌন লিপ্সু ডাকা হবে? তাঁকে এবং আয়িশা (রাঃ)-কে নিয়ে অশ্লীল কথা লিখে কেউ আইনের হাতে ধরা পড়লে তাঁর জন্য কেন তোমার মন কাঁদবে?

আকাশ থেকে পড়লে যা হয়, নিলয়দার অবস্থাও তখন তেমন। নিলয়দা এরকম একটা জবাব পাবেন তা হয়তো কল্পনাও করেনি।

চায়ের বিল দেওয়ার জন্য সাজিদ এগিয়ে গেল। গম্ভীর, রাজনীতিপ্রিয় রাকিব এসে বলল–'দোস্ত, পরানটা ঠাণ্ডা করে দিয়েছিস একদম। বিলটা আমাকে দিতে দে, প্লিজ?'

সাজিদ মুচকি হাসল।

**রেফারেন্স :**


- Jala-Ul Afhaam by Imam Ibnul Qaiyum
- Sahih Al bukhari, Volume 5, Book 58, Hadith 234
- 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী',- শেখ মুজিবুর রহমান

# কোরআন কি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিজের কথা?

সাজিদ একটি মজার গল্প বলতে শুরু করল। গল্প বলার আগে কয়েক বার ঝেড়ে কেশে নিল।

সাজিদ যখন কোনো গল্প বলতে শুরু করে, তখন সে গল্পটির একটি সুন্দর নাম দেয়। এখন সে যে গল্পটি বলতে শুরু করেছে, সেটার নাম 'নিউটন-আইনস্টাইন সমঝোতা এবং বোকা আইনস্টাইনের বিজ্ঞানী হাবলুর কাছে নতিস্বীকার।'

এইখানে নিউটন আর আইনস্টাইনকে তো চিনিই, কিন্তু বিজ্ঞানী হাবলুটা যে আসলে কে, সেটা ঠিক বুঝলাম না প্রথমে। না বুঝলেও কিছু করার নেই। গল্প শুরু না হলে সাজিদকে এ নিয়ে প্রশ্ন করাও যাবে না। এটা তার গল্প ক্লাসের প্রাথমিক শর্ত।

শুধু যে এটা বুঝিনি তা নয়। আরেকটি ব্যাপারও বুঝলাম না। গল্পের নামে বলা হলো 'নিউটন-আইনস্টাইনের সমঝোতা।' বিজ্ঞানী নিউটনের সাথে তো বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কোনোদিন সাক্ষাতও হলো না। দুজন সম্পূর্ণ দুই প্রজন্মের। তাদের মধ্যে তাহলে সমঝোতাই-বা কীভাবে হলো? মনের মধ্যে প্রশ্ন দুটো উশখুশ শুরু করছিল। না পারছি চেপে রাখতে, না পারছি উগরে দিতে।

সাজিদ গল্প বলা শুরু করল। সাজিদের গল্প ক্লাসে উপস্থিত আছি আমি, রাব্বি, রোহান, মোস্তফা আর সবুজ। আমাদের মধ্যে রোহান নাস্তিক টাইপের। পুরোপুরি নাস্তিক নয়, অ্যাগনোস্টিক বলা যেতে পারে। তার ধারণা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কথাগুলোকে ঈশ্বরের বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছে।

যাহোক, আজ কোরআনের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য তারা বসেনি। গল্প শুনতে বসেছে। এই সপ্তাহে সাজিদ গল্প বলবে। এরপরের সপ্তাহে আরেকজন। তারপরের সপ্তাহে আরেকজন, এভাবে।

সাজিদ বলতে শুরু করল–

'আজকে বলব মহাকাশ নিয়ে গল্প। মহাকাশ নিয়ে বলার আগে বলে নিই,

'তখনও Astronomy তথা জ্যোতির্বিদ্যা পদার্থবিদ্যার আওতাভুক্ত হয়নি। অন্তত মহাকাশ নিয়ে বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক রকম মতপার্থক্য।

এই জিনিসটা পদার্থবিদ্যার আওতায় আসার আগে এটা ফিলোসফির বিষয় ছিল। কারও ধারণা ছিল মহাকাশ অসীম, মানে মহাকাশের কোনো শেষ নেই। কারও ধারণা ছিল মহাকাশ অসীম নয়, মহাকাশ সসীম। এটি একটি নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

'এ দুয়ের বাইরে গিয়ে আরেক দল মনে করত, মহাকাশ অসীম, তবে স্থির। অর্থাৎ, এর নির্দিষ্ট সীমা নেই ঠিক, কিন্তু এটি স্থির।

'বিজ্ঞানী নিউটনও তৃতীয় ধারণাটির পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'মহাকর্ষীয় তত্ত্ব' আবিষ্কার করে তখন বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু, এত জনপ্রিয় একটি তত্ত্বের মধ্যে খুবই সূক্ষ্ম একটি ঘাপলা রয়ে গিয়েছিল।'

নিউটনের সূত্রের মধ্যে ঘাপলা ছিল শুনে ম্যানেজমেন্টের ছাত্র রাব্বি তার চোখজোড়া বড় বড় করে বলল–'বলিস কী? প্রতিষ্ঠিত সূত্রের মধ্যে ঘাপলা? এরকমও হয় নাকি?'

সাজিদ বলল–'হ্যাঁ।'

–'কী রকম ঘাপলা?', রাব্বির পাল্টা প্রশ্ন।

সাজিদ বলল–' নিউটনের সূত্র মতে, মহাকর্ষের বস্তুগুলো একে অপরকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু ঘাপলা হচ্ছে, যদি এমনটি হয়, তাহলে মহাশূন্যের বস্তুগুলো নির্দিষ্ট একটি পয়েন্টে এসে মিলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবার কথা। এমনটি হয় না কেন?'

সমাজতত্ত্বের ছাত্র সবুজ বলল–'তাই তো। নিউটন এর কী ব্যাখ্যা দিয়েছে?'

সাজিদ বলল–'নিউটনের কাছে এর কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। এই ব্যাপারটা পরে ক্লিয়ার করেছে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, তার বিখ্যাত 'Theory Of Relativity' দিয়ে। আইনস্টাইন নিউটনের অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধানে বলেছেন, এরকম হতো, যদি Time আর Space শাশ্বত বা পরম হতো। কিন্তু Time আর Space কখনোই পরম নয়। এই বিখ্যাত তত্ত্ব দিয়ে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বিজ্ঞানকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এক নতুন জগতের সাথে। সেই জগতটির নাম 'আপেক্ষিকতার জগত।'

রাব্বি বলল–'ও আচ্ছা, এজন্যে গল্পের নাম দিয়েছিস 'নিউটন-আইনস্টাইনের সমঝোতা', তাই না?'

সাজিদ মুচকি হাসল। আমি একটা সুযোগ পেলাম প্রশ্ন করার। জিজ্ঞেস করলাম–'কিন্তু বিজ্ঞানী হাবলুটা আসলে কে?'

সাজিদ আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। সে আবার গল্প বলতে শুরু করল–

'আইনস্টাইনের এই আপেক্ষিকতার সূত্র ধরে, রাশিয়ান পদার্থবিদ আলেকজান্ডার ফ্রিদম্যান দাবি করেন যে, এই মহাবিশ্ব স্থির নয়, এটি একটি

ক্রমবর্ধমান মহাবিশ্ব। স্যার আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান সাধারণ ধারণা করেছিলেন বটে, কিন্তু যথেষ্ট ব্যাখ্যার অভাবে তার কথা বিজ্ঞানী মহল তখন আমলে নেয়নি। এরপর বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী Georges Lemaître সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী মহলকে একটি শক্ত শক খাওয়ালেন। তিনি বললেন, এই মহাবিশ্ব একটি ক্ষুদ্র পরমাণু কণা, যাকে Super Atom বলা হয়, এর বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, এবং রাশিয়ান বিজ্ঞানী স্যার আলেকজান্ডার ফ্রিদম্যানের সাথে সুর মিলিয়ে বললেন, মহাবিশ্ব স্থির নয়, এটি ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। বলাবাহুল্য, Georges Lemaître-এর এসব দাবিরও ভিত্তি ছিল আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সেই সূত্র।'

মোস্তফা জিজ্ঞেস করল–'Georges Lemaître-এর এটিই কি আমাদের সেই Big Bang Theory?'

সাজিদ বলল–'হ্যাঁ। এটিই হলো বিগ ব্যাং থিওরি। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানিস, বিজ্ঞানী Georges Lemaître আইনস্টাইনের সূত্রকে ভিত্তি করে এই দাবি করলেও আইনস্টাইন নিজেই Georges Lemaître-এর এই দাবিকে নাকচ করে দেয়।'

রাব্বি বলল–'বলিস কি? কেন?'

সাজিদ বলল–'কারণ, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, এটা আইনস্টাইন মেনে নিতে পারেনি। তিনি বললেন, Lemaître তার ব্যাখ্যাতে ম্যাথমেটিক্যালি প্রচুর ভুল করেছেন। আইনস্টাইন আরও বললেন, মহাবিশ্ব অসীম হলেও এটি সম্প্রসারিত হচ্ছে–এটি ভুল ব্যাখ্যা।

'সে যা হোক, এই হলো বিজ্ঞানীদের মধ্যে আর্গুমেন্ট। কিন্তু তাদের এই ডিবেটে না জড়িয়ে, আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল বিজ্ঞানী মহলে একটি বোমা ফাটালেন।'

আমি বললাম–'ও আচ্ছা, তুই বিজ্ঞানী হাবলকেই হাবলু বলেছিলি বুঝি?'

সাজিদ আবারও মুচকি হাসল। বলল–'হ্যাঁ। শোন কী হলো: ১৯২০ সালে বিজ্ঞানী এডউইন হাবল ওরফে বিজ্ঞানী হাবলু একটি টেলিস্কোপ আবিষ্কার করে ফেলল। এটিই রাতারাতি পাল্টে দিল তখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞান জগতকে। মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরিতে বিজ্ঞানী হাবল তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ দিয়ে প্রমাণ করে দেখালেন যে, আমাদের মহাবিশ্বের ছায়াপথগুলো ক্রমাগত একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি এটি প্রমাণ করেন Doppler Effect থিওরি দিয়ে। Doppler Effect হলো: মহাবিশ্বের বস্তুগুলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি আলোকতরঙ্গের উপর ফেলা হয়, তাহলে তরঙ্গ যদি লাল আলোর দিকে সরে আসে, তাহলে বুঝতে হবে ছায়াপথগুলো একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যদি তা না

করে সেটা নীল আলোর দিকে সরে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, ছায়াপথগুলো একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে না গিয়ে, বরং কাছাকাছি চলে আসছে। বারবার এই পরীক্ষাটি করে প্রমাণ করা হয় যে, ছায়াপথগুলো একটি অন্যটির কাছাকাছি নয়, বরং একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ১৯৫০ সালে মাউন্ট পালমারে সে সময়ের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ বসিয়ে এই ব্যাপারটি আরও নিখুঁতভাবে অবজার্ভ করে বিজ্ঞানীরা। হাবলের এই দাবির সাথে বিজ্ঞানী Georges Lemaître-এর দাবি সম্পূর্ণ মিলে যায় এবং সেই পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়, মোটামুটি ১০-১৫ বিলিয়ন বছর আগে একটি ক্ষুদ্র কণা থেকেই আজকের মহাবিশ্বের সৃষ্টি। মজার ব্যাপার হলো যে-আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন, মহাবিশ্ব অসীম হলেও স্থির, সম্প্রসারিত হচ্ছে না, বিজ্ঞানী Georges Lemaître-এর থিওরিকে ভুল বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই আইনস্টাইনই পরে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে বললেন–'বিজ্ঞানী হাবল এবং Georges Lemaître-এর দাবিই সত্য। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে।

'তিনি বিজ্ঞানী Georges Lemaître-এর কাছে অনুতপ্ত হন এবং নিজের ভুলকে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ভুল দাবি করেন।

'এখন বিজ্ঞানী মহলে এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হয়েই চলেছে আজ অবধি।'

এতটুকু বলে সাজিদ থামল। আমরা এক নিশ্বাসে বিজ্ঞানের একটি মজার অধ্যায় থেকে ভ্রমণ করে এলাম। এবার সাজিদ আমাদের মধ্যে যে-অ্যাগনোস্টিক রোহান, যে বিশ্বাস করে, কোরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিজের কথা, তার দিকে ফিরল।

বলল–'রোহান, বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে তোর এসব অবশ্যই জানা থাকার কথা, তাই না?'

রোহান বলল–'হ্যাঁ। জানি।'

–'মাত্র গত শতাব্দীতে বসে আইনস্টাইনও যে মহাবিশ্ব নিয়ে ভুল জানতেন, তা তো তুই জানিস, তাই না?'

–'হ্যাঁ।'

–'বিজ্ঞানী Georges Lemaître আর বিজ্ঞানী হাবলের আগে এই জিনিস তাবৎ দুনিয়ার কেউই জানতো না, ঠিক না?'

–'হ্যাঁ।', রোহানের স্বীকারোক্তি।

সাজিদ বলল–'আচ্ছা রোহান, আমি যদি বলি, তাদের অনেক অনেক অনেক আগে, তাদের প্রায় সাড়ে ১৩০০ বছর আগে একজন ব্যক্তি এসব কথা বলেছে, তুই বিলিভ করবি?'

রোহান চিৎকার করে বলল–'Impossible, Quite impossible.'

সাজিদ তখন বলল–'কোনো রোহান, কোরআনের সূরা আয-যারিয়াতের ৪৭ নাম্বার আয়াতে আছে 'আমি নিজ হাতে মহাকাশকে সৃষ্টি করেছি এবং এটাকে সম্প্রসারিত করে চলেছি।'

'এখানে আয়াতের শেষে মহাকাশের সম্প্রসারণ বোঝাতে যে-'মুসিউন' শব্দ আছে, সেটি একটি সক্রিয় বিশেষণ। চলমান ক্রিয়া নির্দেশক, যা নির্দেশ করে কোনো কাজ অতীতকাল থেকে শুরু হয়ে বর্তমান অবধি চলছে এবং ভবিষ্যতেও তা হয়ে চলবে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলছেন, তিনি মহাবিশ্বকে (এখানে মহাকাশ = মহাবিশ্ব) নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন, এবং সেটাকে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করেই চলেছেন। ঠিক এই কথাগুলোই বিজ্ঞানী Georges Lemaître এবং বিজ্ঞানী হাবল আমাদের গত শতাব্দীতে জানিয়েছেন। বল তো, আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে, মরুভূমিতে উট-বকরি চড়ানো এক বালক এমন একটি কথা কীভাবে বলল; যা আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মাত্র ১৯২৯ সালে? এই কথা না বাইবেলে ছিল না ইঞ্জিলে; না ছিল কোনো গ্রিক পুরাণে, না কোনো মিথোলজিতে। মহাকাশের এমন একটি রহস্যময় ব্যাপার মক্কার একজন নিরক্ষর, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন লোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় পেলেন? বল তো?'

অন্যান্য সময় হলে রোহান বলত, মুহাম্মদ বাইবেল থেকে চুরি করেছে, নয়তো বলত কোনো গ্রিক পুরাণ থেকে মেরে দিয়েছে, কিন্তু সাজিদের বিস্তারিত গল্প শোনার পর তার এই দাবি যে ধোপে টিকবে না, সে সেটা বুঝতে পারল।

সাজিদ বলল–'এটা কি নিরক্ষর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বারা সম্ভব যদি কোনো ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ তাতে না থাকে?'

রোহান মাথা নিঁচু করে বলল–'নাহ।'

সাজিদ বলল–'তাহলে প্রমাণ হলো, কোরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লেখা নয়, এটি একটি ঐশ্বরিক কিতাব, যা নাজিল হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর।'

রোহান কিছু বলল না। তাকে কিছুটা চিন্তিত দেখাল। সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছে যে, চোরের দশদিন, গেরস্থের একদিন।

**রেফারেন্স :**


- সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ৪৭
- A word for word meaning of holy Quran by Mohammad Mohar Ali
- Wikipedia

# স্রষ্টা যদি দয়ালুই হবেন তাহলে জাহান্নাম কেন?

–'আচ্ছা সাজিদ, সৃষ্টিকর্তা কি দয়ালু নাকি পাষাণ?', দেবজিৎদা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সাজিদকে জিজ্ঞেস করল।

আমার পাশে বসা ছিল মিজবাহ। সে বলল–'অদ্ভুত তো! সৃষ্টিকর্তা পাষাণ হবেন কেন? উনি হলেন রহমানুর রহিম। পরম দয়ালু।'

দেবজিৎদা মিজবাহর দিকে তাকালেন। এরপরে বললেন–'মিজবাহ, সৃষ্টিকর্তা যদি পরম দয়ালুই হবেন, তাহলে তিনি তার সৃষ্টিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কেন নরক, আই মিন জাহান্নামের মতো জিনিস বানিয়ে রেখেছেন?'

মিজবাহর চটপট উত্তর–'এটা কোনো প্রশ্ন হলো দাদা? কেউ যদি সৃষ্টিকর্তার কমান্ড ফলো না করে, তাহলে তাকে যদি শাস্তি দেওয়া হয়, সেটা কোনোভাবেই সৃষ্টিকর্তাকে পাষাণ প্রমাণ করে না।'

মিজবাহর এই উত্তর দেবজিৎদাকে সন্তুষ্ট করেছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করতে যাবেন, ঠিক এই সময় সাজিদ বলে উঠল, 'দাদা, আজকের পত্রিকা পড়েছ?'

দেবজিৎদা বললেন, 'না। কেন?'

–'একটা নিউজ আছে।'

–'কী নিউজ?'

সাজিদ দেবজিৎদার দিকে পত্রিকাটা এগিয়ে দিল। পত্রিকার একদম প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে শিরোনাম–'সোনাগাজীতে ৯ বছরের বালিকাকে ৫ জন মিলে গ্যাংরেপ।'

বিস্তারিত অংশে যা লিখা আছে তার সারমর্ম এরকম–

'নোয়াখালীর সোনাগাজীতে ৯ বছরের এক বালিকাকে স্কুল থেকে ফেরার পথে ৫ জন যুবক মিলে ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণের পর তারা মেয়েটিকে আহত অবস্থায় ধান ক্ষেতে ফেলে যায়। মেয়েটিকে খুব গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। শুধুই ধর্ষণ নয়, মেয়েটির শরীরের বিভিন্ন অংশ ব্লেড দিয়ে কাটাও হয়েছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। মেয়েটি এখন পুরোটাই কোমার মধ্যে আছে। ধর্ষণকারীদের গ্রামের লোকজন আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে। জানা গেছে,

মেয়ের বাবা এলাকার মেম্বার। মেম্বারের উপর সালিশ বিষয়ক কোনো এক ব্যাপারে ক্ষোভ থেকেই উনার মেয়ের উপরে এই নির্যাতন চালায় ওরা।'

ঘটনাটা গতকালের। পত্রিকায় ছোট্ট মেয়েটির একটি ছবিও দেওয়া আছে। কি ফুটফুটে চেহারা!

দেবজিৎদা নরম মনের মানুষ। এরকম একটি খবর পড়ার পরে উনার মনটা মুহূর্তেই বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল। দাঁতে দাঁত খিচে অনেকক্ষণ ঐ ৫ জন ধর্ষণকারীদের গালাগাল দিলেন।

সাজিদ পত্রিকাটি ব্যাগে রাখতে রাখতে বলল–'দাদা, ধরো, এই ৫ জনকে কোর্টে তোলা হলো আর তুমি হলে বিচারক। এই ৫ জন যে আসল অপরাধী তার সমস্ত রকম তথ্যপ্রমাণ তোমার কাছে পেশ করা হয়েছে। এখন একজন নাবালিকার উপরে এরকম নির্মমভাবে নির্যাতন করার জন্য তুমি কি তাদের শাস্তি দেবে?'

দেবজিৎদা দাঁতমুখ খিচে বললেন–'শাস্তি দিব মানে? শূয়োরের বাচ্চাগুলোকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবো।'

সাজিদ মুচকি হাসল। বলল–'সত্যিই তাই?'

–'হ্যাঁ, একদম। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে এদের মাংস শেয়াল-কুকুর দিয়ে খাওয়াতে পারলেই আমার গা জুড়োবে।'

দেবজিৎদার চোখমুখ লালবর্ণ ধারণ করেছে। উনাকে এরকম অবস্থায় আগে কখনো দেখিনি।

সাজিদ এক গ্লাস পানি উনার দিকে বাড়িয়ে দিল। পানিটা ঢকঢক করে পান করে উনি শার্টের হাতা দিয়ে মুখ মুছলেন। উনি তখনও প্রচণ্ড রেগে আছেন বোঝা যাচ্ছে।

সাজিদ বলল–'আমি যে-দেবজিৎ দাদাকে চিনি, সে কিন্তু এতটা হিংস্র না। আমি তাকে জানতাম দয়ালু, ক্ষমাশীল, মহানুভব হিসেবে। সে যে কাউকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়ার কথাও ভাবতে পারে, সেটাই বিরাট আশ্চর্য লাগছে।'

দেবজিৎদা সাজিদের দিকে তাকালেন। তাকানোতে একটা তাচ্ছিল্যতা আছে।

বললেন, 'কোনো সাজিদ, আমি দয়ালু, মহানুভব ঠিক আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি কোনো অন্যায় দেখে চুপ করে থাকব। আমার ক্যারেক্টারের ক্রাইটেরিয়াতে যেমন দয়ালু, মহানুভবতা, উদারতা–এসব আছে, ঠিক তেমনি আমি ন্যায়বিচারকও। অন্যায়ের কোনো প্রশ্রয় আমার কাছে নেই।'

–'বিচারক হিসেবে তুমি চাইলেই ঐ ৫ জন অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতেই পার।', সাজিদ বলল।

–'হ্যাঁ পারি। কিন্তু তাহলে যে ঐ নিষ্পাপ মেয়েটার সাথেই অন্যায় করা হবে। অবিচার করা হবে। আমি সেটা পারব না।'

–'তাহলে কি ধরে নেব যে, তুমি পাষাণ? কঠিন হৃদয়ের? তোমার মাঝে কোনো ভালোবাসা নেই, মমতা নেই?'

দেবজিৎদা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য! তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কি সব লোপ পেয়েছে রে সাজিদ? ৫ জন লোক ঘোরতর অন্যায় করেছে। তাদের অন্যায়ের জন্য আমি তাদের শাস্তি দিব এটাই স্বাভাবিক। একজন বিচারক হিসেবে এখানে ন্যায়ের পক্ষ নেওয়াই আমার ধর্ম, আমার প্রেম, আমার ভালোবাসা। এটা কি প্রমাণ করে যে, আমি পাষাণ?'

সাজিদ আবার মুচকি হাসল। বলল–'দাদা, তোমাকে উত্তেজিত করার জন্য দুঃখিত। তুমি না আসলেই খুব ভালো।'

সৃষ্টিকর্তা যেমন পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল, ঠিক তেমনি তিনি আবার একজন ন্যায়বিচারকও। তিনি কারও সাথে বিন্দু পরিমাণও অবিচার হতে দেন না। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট রুলস তৈরি করে দিয়েছেন। এখন কিছু লোক এই রুলস ফলো করে যদি তার দেওয়া বিধান মতো জীবনযাপন করে, তাদের তিনি পুরস্কার হিসেবে জান্নাত দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এখন একদল লোক নামাজ-কালাম পড়ে, মিথ্যে কথা বলে না, লোক ঠকায় না, চুরি-রাহাজানি করে না, সুদ-ঘুষ খায় না, মানুষ খুন করে না–মোদ্দাকথা, সকল প্রকার অন্যায় থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে কেবল স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ এবং তাঁর প্রতিশ্রুত জান্নাতের জন্য।

'অপরদিকে আরেকদল লোক এসবের থোড়াই কেয়ার করে যদি ভোগবিলাসে মেতে উঠে, সকল অন্যায় কাজ করে, স্রষ্টার অবাধ্য হয়, তাহলে স্রষ্টা যদি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে আগের দলের সাথে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে এটা কি ন্যায় হলো? প্রথম দলকে তো ঠকানো হলোই, সাথে কি পরের দলের সকল অন্যায়কে মেনে নেওয়া হলো না? প্রশ্রয় দেওয়া হলো না? তুমি যেভাবে বিচারকের আসনে বসে ক্ষমতা থাকার পরও ঐ ৫ জনকে ক্ষমা করে দিতে পার না কেবল ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য, স্রষ্টাও কি সেটা পারেন না?'

দেবজিৎদা কিছু বললেন না। সাজিদ আবার বলল–'এটা হলো স্রষ্টার ক্রাইটেরিয়া। তিনি যেমন পরম দয়ালু, ঠিক সেরকম ন্যায় বিচারকও।'

'আরেকটু পরিষ্কার করি। ধরো, একজন বাবার দুটি সন্তান। দুই সন্তানের প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে বিনা কারণেই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। যাকে ধাক্কা দিল সে মাটিতে পড়ে খুব ব্যথা পেল এবং চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

'এখন বাবা এসে যদি প্রথমজনকে তার অন্যায়ের জন্য কোনো শাস্তি না দেয়, তাহলে সেটা তার দ্বিতীয় সন্তান, যে নিষ্পাপ, তার প্রতি কি অন্যায় করা হবে না?'

–'হুঁ', দেবজিৎদা বললেন।

–'স্রষ্টা এরকম নন। এজন্যই তিনি জান্নাত আর জাহান্নাম দুটোই তৈরি করে রেখেছেন। আমাদের কর্মফলই নির্ধারণ করে দেবে আমাদের গন্তব্যস্থল। এতে কোনো দুই নাম্বারি হবে না। কারও সাথে চুল পরিমাণও অন্যায় হবে না।'

দেবজিৎদা বললেন–'তা বুঝলাম। কিন্তু তিনি যেহেতু স্রষ্টা, তিনি আমাদের চেয়ে হাজার গুন দয়ালু হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই তিনিই আবার আমাদের কর্ম পরিচালনা করছেন, আবার তিনিই আমাদের ধরে ধরে জাহান্নামে পাঠাচ্ছেন। ব্যাপারটা কেমন না সাজিদ?'

সাজিদ বলল–'দাদা, স্রষ্টা আমাদের একটা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সাথে পাঠিয়েছেন একটা গাইডবুক। এখন এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেই আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, আমরা কি তাঁর দেখানো পথে চলব, কি চলব না। যদি চলি, আমরা জান্নাতে যাব। যদি না চলি, আমরা জাহান্নামে যাব। মোদ্দাকথা, আমরা কোথায় যাব তা আমরাই নির্ধারণ করি আমাদের কর্মের মাধ্যমে। তবে দাদা, ব্যাপার হলো, আমাদের কর্মের ব্যাপারে উনি ওয়াকিবহাল। কারণ উনি সর্বজ্ঞাত। তিনি আলিমুল গায়েব। তাই, তিনি আগ থেকেই জানেন বলেই তা আমাদের ভাগ্যলিপি হিসেবে লিখে রেখেছেন।'

দেবজিৎদা হাসলেন। বললেন, 'ও আচ্ছা। তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস যে, কিছু লোক স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে জাহান্নাম বেছে নিচ্ছে?'

–'হ্যাঁ।'

–'উদ্ভট না কথাটা?'

–'একদম না।'

–'লজিক্যালি বল।'

–'আচ্ছা। ধরো, তুমি গভীর সাগরে জাহাজ থেকে পানিতে পড়ে গেলে। পানিতে তুমি হাঁসফাঁস করছ। একটু পরেই অতলে তলিয়ে যাবে। এখন ধরো, তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমি একটি লাইফ জ্যাকেট তোমার দিকে বাড়িয়ে দিলাম।'

–'হু, তো?'

–'সেই মুহূর্তে তোমার কাছে দুটি অপশন। হয় লাইফ জ্যাকেটটি নিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবে নয়তো, আমাকে ডিনাই করবে আর অতল সাগরে তলিয়ে যাবে এবং মৃত্যুবরণ করবে।

'খেয়াল করো, আমি কিন্তু বাঁচার উপকরণ, অর্থাৎ লাইফ জ্যাকেট তোমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছি। এখন তুমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে জ্যাকেটটি গ্রহণ করে প্রাণে বাঁচবে নাকি ডিনাই করে মৃত্যুকে বরণ করবে সেটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার। স্রষ্টাও জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপকরণ আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। সাথে আমাদের ফ্রি উইলও দিয়ে দিয়েছেন। এখন, আমরা তা আঁকড়ে ধরে বাঁচব, নাকি উপেক্ষা করে মরব তা আমাদের উপর নির্ভর করছে।'

দেবজিৎদা কিছু বললেন না। স্রষ্টা দয়ালু হয়েও কেন জাহান্নাম তৈরি করেছেন তার উত্তর তিনি মনে হয় পেয়ে গেছেন। চায়ের বিল পরিশোধ করে এসে দেবজিৎদা বললেন–'স্রষ্টা যেহেতু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু, তিনি কিন্তু চাইলেই পারেন ক্ষমা করে দিতে।'

সাজিদ বলল–'স্রষ্টা শুধু তোমার চেয়ে অনেক বেশি দয়ালুই নন, তোমার চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়বিচারকও বটে। সুতরাং...'

সাজিদকে আর কিছুই বলতে দিলেন না দেবজিৎদা। মনমরা করে বললেন–'বুঝেছি।'

সাজিদ হাসল। দেবজিৎদার এই চাহনি দেখে আমাদেরও হাসি পেল। আমরাও হাসলাম। আমাদের হাসতে দেখে তিনিও আমাদের সাথে হাসা শুরু করলেন। হা হা হা।

# কোরআন মতে পৃথিবী কি সমতল না গোলাকার?

খুবই সিরিয়াস একটি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ঠিক আলোচনা নয়, আদতে হাসাহাসি হচ্ছে।

যারা হাসাহাসি করছে তাদের সবাই খুবই স্মার্ট। শুধু স্মার্ট নয়, ওভার স্মার্ট বলা যায়। এরা কথায় কথায় বলে, আমরা বিজ্ঞান ছাড়া কিছুই বুঝি না। এরা উঠতে-বসতে, হাঁটতে-চলতে সবকিছুতেই বিজ্ঞানের প্রমাণ খোঁজে। কেউ যখন তাদের বলে বিজ্ঞানের এটা এরকম নয়, ওরকম, তখন তারা তেড়েমেড়ে এসে বলবে–'বাপু, তুমি কি বিজ্ঞানী? বিজ্ঞান নিয়া পড়াশোনা আছে? কয় ক্লাস বিজ্ঞান পড়েছো যে বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতে আসছ? যাও, আগে পড়ো, পরে লেকচার দিবা।'

আবার এই তারাই অনলাইনে কিছু ছাইপাশ পড়া মুক্তমনা তথা নাস্তিকদের লেখা পড়ে সেটাকে এত পরিমাণ বিশ্বাস করে যে, নিজের বাবা-মাকেও এরা এত বিশ্বাস করে না।

এসব নাস্তিকের অধিকাংশই এমন, যারা আরবিতে কোরআন পড়তেই জানে না। কিছু ইংরেজি অনুবাদ এবং বাংলা অনুবাদের খিস্তি উড়িয়ে বলে–'কোরআনের এটা ভুল, সেটা ভুল। কোরআনের এইটা অবৈজ্ঞানিক, ঐটা অবৈজ্ঞানিক।'

লেখা পড়ে মনে হবে, এরা একেকজন বড় বড় মুফতি ছিল এক সময়। কোরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এতসব ভুলভ্রান্তি দেখে তারা আজকে নাস্তিক হয়ে গেছে।

এরা আরবিতে কোরআন পড়া তো দূরে থাক, অধিকাংশই ২৯টি আরবি হরফ ঠিকঠাক মতো বলতেও পারবে না।

এ মুহূর্তে হাসাহাসি হচ্ছে কোরআনে পৃথিবীর আকার নিয়ে।

হাসাহাসি করছে বিপুল, সৌরভ আর নিপুণদা।

বিপুলকে আগে জুমার নামাজে দেখতাম। এখন সে নাকি ধর্মকর্ম করছে না। বিপ্লব নিয়ে আছে। কমিউনিজম বিপ্লব। বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে ছেলেদের মধ্যে এমনিতেই রক্ত গরম, রক্ত গরম টাইপ একটা ভাব থাকে। এই ভাবের সাথে যখন দুচারখানা মার্ক্স আর লেলিনের কিতাব যুক্ত হয়, তখন তো কথাই নেই। স্বপ্নের মধ্যেও তখন হেলাল হাফিজের পঙক্তি 'এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময় ', জপতে থাকে।

বিপুলেরও একই অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কি না কি পড়েছে, তাতেই এখন ঈশ্বরকে অলীক কল্পনা মনে করা শুরু করেছে। অবশ্য, এর পেছনে মোক্ষম ভূমিকা পালন করেছে নিপুণদা। তিনি কট্টর বাম। আমাকেও কয়েকবার আরজ আলি মাতুব্বরের বই পড়তে দিয়েছিল। আমি পড়ে হাসিমুখে ফেরত দিয়েছিলাম। আমার কাছ থেকে বই ফেরত নেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন-'কী? কী বুঝলে ভাইয়া?'

আমি ফিক করে হেসে বললাম-'বুঝলাম যে, লোকটার মেন্ট্যাল ট্রিটমেন্ট দরকার ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি বিনা চিকিৎসায় গত হয়েছেন।'

আমার মুখ থেকে এরকম কথা শুনে নিপুণদা খুব চমকে গেলেন। এখন বুঝতে পারছি তিনিই বিপুল আর সৌরভের ব্রেইন ওয়াশ করেছেন।

এরা এখন যা পড়ে হাসাহাসি করছে, তা একজন ব্লগারের লেখা। ব্লগারটা হিন্দু পরিবারের। হিন্দু পরিবারের হলেও উনি নিজের ধর্মত্যাগ করে এক সময় নাস্তিকতা চর্চা শুরু করেন। পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার।

এই ব্লগার লিখেছেন, 'মুহাম্মদের আল্লা কি জানত না যে, পৃথিবী গোলাকার, সমতল নয়? তাহলে মুহাম্মদের আল্লা পৃথিবীকে সমতল বলল কেন? আসলে, কোরআন কোনো ইশ্বরের বাণীটানী না। এটা স্রেফ মুহাম্মদের নিজের বানানো। ১৪০০ বছর আগে মানুষ বিশ্বাস করত যে পৃথিবী হলো সমতল। মুহাম্মদ তখন যা বিশ্বাস করত, তাই লিখে দিছে আর বলে দিছে এইটা আসছে আল্লার কাছ থেইকা। হা হা হা। বোকা মুমিনগুলা এইটারে আল্লার বাণী মনে কইরা বাকুম বাকুম করতাছে।'

প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করল এই আয়াতগুলো-'তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিছানাস্বরূপ।' সূরা নূহ : ১৯

'And Allah has made the earth for you as a carpet (spread out).

তিনিই তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানাস্বরূপ। আর তাতে তোমাদের জন্য করেছেন চলার পথ।' সূরা ত্বহা : ৫৩

'Has enabled you to go about therein by roads (and channels).

অতঃপর, তিনি তার জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। সূরা আন-নাজিয়াত ৩০

আমি আর সাজিদ পাশাপাশি বসে আছি। আমার তো গা জ্বলে যাচ্ছে এদের বিদ্রূপ-ঠাট্টা দেখে। সাজিদ একদম শান্তভাবে বসে বসে এসব শুনছে। কী করে যে পারছে কে জানে।

নিপুণদা বলল-'কী সাজিদ মিয়া, তোমার কি কিছু বলার আছে এই ব্যাপারে?'

সাজিদ হাসল; সচরাচর যেমন হাসে। এরপর বলল–'দাদা, তোমরা বলে যাও। আমি না হয় আজ শুনেই যাই।'

–'না না, তোমাকেও বলতে হবে। বলতে হবে তুমি কি বিশ্বাস করো, পৃথিবীটা কার্পেটের মতো সমতল? নাকি বিশ্বাস করো পৃথিবীটা গোলাকার?', নিপুণদা বলল।

সাজিদ বলল–'আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীটা গোলাকার।'

–'হা হা হা। তাহলে তো কোরআনের সাথে বিপরীত হয়ে গেল। কোরআন বলছে পৃথিবীকে কার্পেটের মতো সমতল করে বিছানো হয়েছে। ডু ইউ বিলিভ ইট?'

সাজিদ কিছু বলল না। একটু ঝেড়ে কেশে নিল। এরপর বলল–'দাদা, অনেকক্ষণ ধরেই খেয়াল করছি তোমরা বলছো 'সমতল সমতল।' আচ্ছা, কোরআনের ঠিক কোনো জায়গায় বলা হয়েছে পৃথিবীটা সমতল?'

নিপুণদা বলল–'আরে, কোরআন বলেছে পৃথিবীকে বিছানার মতো বিছানো হয়েছে। এর মানে কি এই নয় যে, পৃথিবীটাকে সমতল বলা হয়েছে?'

সাজিদ বলল–'দাদা, প্রথমেই বলে রাখি, অনুবাদ দিয়ে কোরআনকে জাস্টিফাই করাটা ভুল। দেখো, সমতল শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'সাবি', 'আল মুস্তাবি' এসব। কোরআন যদি সত্যিই পৃথিবীকে সমতল বলত, তাহলে কোরআন নিশ্চয় এই শব্দগুলো ব্যবহার করত। কিন্তু কোরআন এখানে এসব শব্দ ব্যবহার করেনি। কোরআন এখানে ব্যবহার করেছে 'ফারাশ', 'বাসাত', 'দাহাহা', এই জাতীয় শব্দ যার কোনোটার অর্থই 'সমতল' নয়। এগুলোর অর্থ 'কার্পেট' বা 'বিছানার মতো করে বিছানো'; Spread Out. এগুলো দিয়ে কোনোভাবেই বোঝায় না যে পৃথিবী সমতল।'

নিপুণদা অনেকটাই বিদ্রূপ করে বলল–'তাহলে কী বোঝায় এগুলো দিয়ে স্যার সাজিদ?'

সাজিদ বলল–'Let me finish...

'আমরা কোরআনের সেই আয়াতে চলে যাই, যেটা নিয়ে তোমাদের আপত্তি। যেটাতে নাকি বলা হচ্ছে পৃথিবী সমতল। আয়াতটি হলো: 'তিনিই তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানাস্বরূপ। আর তাতে তোমাদের জন্য করেছেন চলার পথ।'

'দেখো দাদা, আল্লাহ্ বলছেন, তিনি আমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানাস্বরূপ, কার্পেটের মতো করে। আচ্ছা দাদা, বিছানা বলতে আমরা কী বুঝি? আমরা বুঝি, বিছানা এমন একটি জিনিস, যা নরম, আরামদায়ক। যাতে বিশ্রাম নেওয়া যায়। যদি এটাকে রূপক হিসেবে ধরি, তাহলে এটা এমন কিছু যাতে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকা যায়, চলাফেরা করা যায়। আজকের বিজ্ঞানও আমাদের সেটা বলছে। বিজ্ঞান আমাদের বলছে, আমাদের পৃথিবীর ভূত্বক মোট

৭টি স্তরে বিভক্ত। এই স্তরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উপরের স্তরের নাম হলো ক্রাস্ট। এই স্তরের পুরুত্ব ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত। এটিই সেই স্তর, যে-স্তরে আমরা বসবাস করি, চলাফেরা করি। এরপরে আছে Mentle। এই স্তরের পুরুত্ব ২৯০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হলো ৯০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রায় মানুষ তো দূরের কথা, একটি ক্ষুদ্র জীবও মুহূর্তে ভস্ম হয়ে যাবে। চিন্তা করো তো, পৃথিবীর যে স্তরে আমরা বাস করছি, হাঁটছি, চলছি, ঘুরছি-ফিরছি, তার থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার গভীরে এই ভয়াল স্তর অবস্থিত। এটা তো মাত্র দ্বিতীয় স্তরের কথা। এরপরের স্তরের নাম হলো Outer Core। এর পুরুত্ব হলো ২৮৯০ কিলোমিটার এবং এই স্তরের তাপমাত্রা হলো ৩৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চিন্তা করো, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ এইসব স্তরে ঠিক কী ঘটে?

'এর পরের স্তরের নাম হলো Inner Core। এটা তো আরও ভয়াবহ। এভাবে যত নিচে নামা হয়, স্তরগুলো ততোই ভয়ানক। আমরা যে আগ্নেয়গিরির লাভা দেখি, এটা এসব স্তরের ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ মাত্র। কিন্তু আমরা যে-স্তরে থাকি, সেই Crust স্তরের তাপমাত্রা অন্য ৬ স্তরের তাপমাত্রার তুলনায় মাত্র ১%, যা আমাদের বসবাসের উপযোগী। এখন, এই দিকটার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ যদি বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছি বিছানাস্বরূপ', তাতে কি বোঝায় যে আল্লাহ্ এটা দ্বারা পৃথিবীর শেইপ বুঝিয়েছেন? একদম না। এটা দিয়ে যে আল্লাহ্ ভূত্বকের ঐ স্তরের কথাই মিন করেছেন, যা আমাদের বসবাসের উপযোগী, তা আয়াতের পরের অংশ থেকেই বোঝা যায়। আয়াতের পরের অংশেই আছে 'আর, তাতে তোমাদের জন্য করেছেন চলার পথ।'

'এটা তো একদম পরিষ্কার যে, এটা পৃথিবীর আকার নয়, ভূমির ব্যাপারে বলা হয়েছে এবং ভূমির সেই অংশের ব্যাপারে, যে অংশে আমরা, মানুষেরা বসবাস করছি। যেটা আমাদের বসবাসের জন্য উপযোগী। তাহলে এটা দিয়ে পৃথিবীকে সমতল বানিয়ে দেওয়া যায় কী করে? স্রেফ মনগড়া ব্যাখ্যা।'

নিপুণদা চুপ করে আছে। বিপুল বলে উঠল–'আচ্ছা সাজিদ ভাই, আপনার কথা মানলাম যে, এখানে পৃথিবীর আকার নয়, ভূমির স্তরের কথা বলা হয়েছে আর সেটাকে বিছানার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি কি কোরআনের এমন একটি আয়াত দেখাতে পারবেন যেখানে বলা হচ্ছে পৃথিবী গোল? সমতল নয়?'

বিপুলের কথা শুনে সাজিদ হেসে উঠল। বলল–'বিপুল, তার আগে তুমি বলো তো, কোরআন কী মানুষকে পৃথিবীর শেইপ কী রকম, পদার্থবিদ্যায় কী কী ঘটে, রসায়নে কোন যৌগের সাথে কোন যৌগের বিক্রিয়া ঘটে এসব শেখানোর জন্য নাজিল হয়েছে?'

–'না।', বিপুল বলল।

–'তাহলে তুমি কি করে এক্সপেক্ট করো যে, কোরআন পৃথিবীর আকার, আয়তন নিয়ে বলবে?'

এবার বিপুলও চুপ। কিন্তু সাজিদ আর চুপ হলো না। সে বলে যেতে লাগল–'ঠিক আছে বিপুল। তুমি যখন আশা করেছ, তখন আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারি যে, কোরআন পৃথিবীর আকার নিয়ে বলেছে এবং সেটা গোলাকার।'

এবার আমি, নিপুণদা, বিপুল আর সৌরভ চোখ বড় বড় করে সাজিদের দিকে তাকালাম। বলে কি ব্যাটা! কোরআন পৃথিবীকে গোলাকার যদি বলেই থাকে, তাহলে এতক্ষণ এত কাহিনি বলার কি কোনো দরকার ছিল?

নিপুণদা হো হো করে হেসে উঠল। বলল–'এবার কি নতুন তত্ত্ব শোনানো হবে নাকি? হা হা হা।'

নিপুণদার সাথে সাথে বিপুল আর সৌরভও হেসে উঠল। তাদের সাথে সাজিদও হাসছে। আমার তখন সাজিদের উপর খুব রাগ হচ্ছে।

সাজিদ বলল–'নিপুণদা, একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে প্লিজ। কোরআন সরাসরি পৃথিবীকে গোলাকার বলেনি। বলার দরকারও ছিল না। কারণ কোরআন জিওগ্রাফির কোনো বই নয় যে, এখানে পৃথিবীর আকার, আকৃতি নিয়ে বলাই লাগবে। তবে, কোরআন কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে। জ্ঞানীদের উচিত তা বুঝে নেওয়া।'

নিপুণদা বলল–'তাই বুঝি? তা বুঝিয়ে দেন দেখি মহাজ্ঞানী সাজিদ ভাই। হা হা হা।'

সাজিদ বলল–

'প্রথমত: সূরা আয্-যুমারের ৫ নং আয়াত। বলা হচ্ছে, 'তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা।'

'এই আয়াতে রাত দিন দ্বারা এবং দিন রাত দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়া বোঝাতে যে আরবি শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা হলো "يُكَوِّرُ"। এই শব্দটির একদম সঠিক অর্থ হলো প্যাঁচানো/জড়ানো। ক্লাসিক্যাল আরবি ডিকশনারিতে এর অর্থের ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে এটি ঠিক এমন: কোনো পাগড়ির মধ্যে একটি কাপড় অন্য একটি কাপড়ের মধ্যে যেভাবে প্যাঁচিয়ে ঢোকানো হয়। একটি অন্যটির মধ্যে প্যাঁচিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। জীবনে কখনো পাগড়ি দেখলে বা পাগড়ি বেঁধে থাকলে ব্যাপারটা ভালো বোঝার কথা। আল্লাহ্ বলেছেন তিনি রাত দ্বারা দিনকে এবং দিন দ্বারা রাতকে ঠিক সেভাবেই আচ্ছাদিত করেন। এখন রাতকে দিন দ্বারা এবং দিনকে রাত দ্বারা এভাবে আচ্ছাদিত করা তখনই সম্ভব, যখন পৃথিবীর আকার গোল হবে।

'আমরা দেখি কীভাবে দিন-রাত্রি হয়। প্রথমে ভোর, এরপর আস্তে আস্তে দুপুর, এরপর বিকেল, এরপর গোধূলি, এরপর সন্ধ্যা, এরপর একসময় দিন রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায় যেভাবে আস্তে আস্তে পাগড়ির একটা অংশ অন্য অংশের

মধ্যে ঢুকে পড়ে। যদি পৃথিবী সমতল হতো, একটা লম্বা কাঠ বা তার মতো, তাহলে কি এভাবে দিনরাত্রি হতো? না। তখন এই দিন হতো, আবার চোখের পলকে এই রাত নেমে পড়ত। তাহলে সূরা যুমারের এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে আচ্ছাদিত করার যে-প্রক্রিয়া বলেছেন সেটা তখনই সম্ভব, যখন পৃথিবী গোলাকার হবে। তাহলে কোরআন ইন্ডাইরেক্টলি ইঙ্গিত করছে যে পৃথিবী গোলাকার।

'দ্বিতীয়তঃ সূরা আর রহমানের ১৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন–'তিনিই দুই অস্তাচল আর দুই উদয়াচলের মালিক।'

'এখানে অস্তাচল আর উদয়াচল বলতে সূর্যের উদয়-অস্তের কথা বলা হচ্ছে। আমরা জানি, পৃথিবীতে একদিনে দুবার সূর্যোদয় আর দুবার সূর্যাস্ত ঘটে থাকে। আমরা বাংলাদেশে যখন সূর্যকে পূর্বদিকে উদিত হতে দেখি, তখন আমেরিকানরা দেখে যে সেখানে সূর্যটা পশ্চিমে ডুবে যাচ্ছে। তাহলে আমাদের এখানে যখন সকাল, তাদের কাছে তা সন্ধ্যা। আবার, আমরা যখন সূর্যকে পশ্চিমে ডুবে যেতে দেখি, তারা তখন সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত হতে দেখে।

'তার মানে পৃথিবীতে মোট দুবার সকাল, দুবার সন্ধ্যা পরিলক্ষিত হয়। এখন, দুবার সূর্যাস্ত আর আর দুবার সূর্যোদয় তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীর আকার গোল হবে। পৃথিবীর আকার যদি সমতল বা চ্যাপ্টা কাঠ বা তার মতো হতো, তাহলে পৃথিবীতে একবারই সূর্যাস্ত-সূর্যোদয় ঘটত। লম্বা কাঠ সদৃশ পৃথিবীর একপাশে সূর্য উঠে অন্যপাশে ডুবে যেত। কিন্তু সেরকম হয় না, কারণ পৃথিবী গোলাকার। এজন্য পৃথিবীতে আমরা দুবার সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয় দেখতে পাই।

'আল্লাহ্ও কোরআনে একই কথা বলছেন। তিনি বলেছেন–'তিনিই মালিক দুই অস্তাচল আর উদয়াচলের।' তাহলে তিনি নিশ্চয় জানেন পৃথিবী গোলাকার। তাই তিনি দুই সূর্যাস্ত আর দুই সূর্যোদয়ের কথা বলেছেন। তিনি যদি পৃথিবীকে ফ্ল্যাট তথা সমতলই বলবেন, তাহলে অবশ্যই তিনি এক অস্তাচল আর এক উদয়াচল-এর কথাই বলতেন। কিন্তু তিনি তা বলেননি। তার মানে, কোরআন ইঙ্গিত করছে যে, পৃথিবী গোলাকার।'

এতটুকু বলে সাজিদ থামল। বিপুল চুপ করে আছে। নিপুণদাও। তাদের হয়তো আর কিছু বলার নেই এই মুহূর্তে। সৌরভ বলল–'সবই বুঝলাম, কিন্তু পৃথিবীর ভূমিকে বিছানা বলার কি দরকার? এত জটিল করে...'

সাজিদ হাসল। বলল–'সৌরভ, আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, তখন নিপুণদা আমাকে একটি লাভ লেটার দিয়েছিলেন বিপাশাদিকে দেওয়ার জন্য। কি নিপুণদা, দাওনি?'

নিপুণদা লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে বলল–'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে বলছ কেন এসব?'

–'জানো নিপুণদা, আমি সেই চিঠিটা বিপাশাদিকে দেওয়ার আগে খুলে একবার পড়ে নিয়েছিলাম। হা হা হা হা। কি রোমান্টিক প্রেমপত্র ছিল সেটা! হা হা হা।'

নিপুণদা হাসছে, লজ্জাও পাচ্ছে। আমরাও হাসছি। সাজিদ বলল–'জানো সৌরভ, সেই চিঠির শুরুতেই বিপাশাদির রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিপুণদা লিখেছে–'তোমার ঐ চাঁদমুখখানা না দেখলে আমার দিনটাই পানসে লাগে।'

আমরা সবাই হো হো হো করে হাসছি। সাজিদ আবার বলল–'আচ্ছা সৌরভ, নিপুণদা যে বিপাশাদির মুখকে চাঁদমুখ বলেছে, এখানে নিপুণদা কি বুঝিয়েছে যে, বিপাশাদির মুখ দেখতে চাঁদের আকৃতির মতো? আই মিন গোলাকার?'

সৌরভ বলল–'না, উনি বিপাশাদির রূপ বুঝিয়েছেন এটা দিয়ে।'

–'এক্সাক্টলি। নিপুণদা সেদিন 'চাঁদমুখ' দিয়ে আসলে বিপাশাদি'র রূপ বুঝিয়েছে, বিপাশাদির মুখের আকৃতি না। এটাকে বলে উপমা। ঠিক সেরকম আল্লাহ্ও পৃথিবীর ভূমিকে বিছানার উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি আমাদের জন্য কত উপযোগী করেই-না এটা তৈরি করেছেন। এটা দিয়ে তিনি পৃথিবীর আকৃতি বা আমার বা তোমার বেডরুমের বিছানা বুঝাননি, বুঝেছো?'

সৌরভ একদম চুপ মেরে গেল। বুঝেছে। বিপুলও চুপচাপ। সাজিদ নিপুণদার কাছে গিয়ে বলল–'স্যরি ভাই, ঐ চিঠিটা তোমার পারমিশন ছাড়াই পড়েছিলাম বলে। কী করব বলো? তোমাদের মতো সিনিয়ারদের থেকেই তো এক্সপেরিয়েন্স নিতে হবে, তাই না? হা হা হা।'

নিপুণদা সাজিদকে ধরতে যাচ্ছিল, আর অমনি সে এমন এক দৌঁড় দিল...

পুনশ্চ: তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, আল্লাহ্ সত্যি সত্যিই পৃথিবীকে কার্পেটের মতো করে তৈরি করেছেন, তাহলেও কোনো ভুল হবে না। কারণ কার্পেট যে শুধু সমতল জিনিসে করা হয় তা নয়। গোলাকার জিনিসেও কার্পেট করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ফুটবলের কথা চিন্তা করুন। ফুটবল একটি গোলাকার জিনিস। এর উপরিভাগ কী রকম? কার্পেটের মতো করে আচ্ছাদিত। এখন আল্লাহ্ যদি বলেন, তিনি ভূমিকে কার্পেটের মতো করে বিছিয়েছেন, তাহলে ধরা যায় যে, ফুটবলের মতো গোলাকার ভূমিকে তিনি কার্পেটের মতো বিছিয়েছেন। তাছাড়া, সূরা আল ইনশিক্বাকের ৩ নাম্বার আয়াতে আছে–'যেদিন পৃথিবীকে সমতল করা হবে...।' এখানে বলা হচ্ছে কিয়ামত দিবসের কথা। সেদিন পৃথিবীকে আল্লাহ্ সমতল করবেন। তাহলে, তিনি যদি এখনই পৃথিবীকে সমতল করে তৈরি করতেন, আবার কিয়ামত দিবসে এটাকে সমতল করার কথা আসে কীভাবে?

# একটি ডিএনএ'র জবানবন্দী

সেদিন সকালবেলা বাসায় ছিলাম। আমার ক্লাস ছিল না বলে আমি ইউনিভার্সিটিতে যাইনি। সাজিদের ক্লাস ছিল। আমি বাসায় বসে বসে শেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট' পড়ছিলাম।

দুঃখের কাহিনি আমি একদম পড়তে পারি না। হ্যামলেট পড়তে গিয়ে কখন যে আমার চোখজোড়া অশ্রুসজল হয়ে উঠল, আমি খেয়ালই করিনি। এই জিনিস আর বেশিক্ষণ পড়া যাবে না। না হলে কেঁদেকেটে আমি বুক ভাসিয়ে ফ্লোরে ছোটখাটো জলাশয় বানিয়ে ফেলব, শিওর।

হাত থেকে ধপ করে টেবিলের উপর রাখলাম 'হ্যামলেট'। খুব মন খারাপ।

এই মুহূর্তে সাজিদ থাকলে সে নিশ্চয় আমাকে নিয়ে রসিকতা করত।

একবারের কথা। টেলিভিশনে একটা মুভি দেখাচ্ছিল। মুভিতে দেখাচ্ছিল নায়কের সৎ মা নায়ককে খেতে দিচ্ছে না, পরতে দিচ্ছে না। নায়কের বাবা নায়কের জন্য প্রচুর সম্পত্তি উইল করে রেখে যায়। সেগুলো থেকে বঞ্চিত করতে নায়কের সৎ মা নায়ককে ছোটবেলায় শহর থেকে অনেক দূরে রেখে আসে। নায়ক খুবই মানবেতর জীবনযাপন করে। একটি চায়ের দোকানে চাকরি করে।

এই দৃশ্য দেখে টপটপ করে আমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সেদিন আমার এই অবস্থা দেখে সাজিদ আমাকে নিয়ে এতই হাসাহাসি করল যে, আমি এরপর থেকে তার সাথে বসে আর কোনোকিছুই দেখি না। আজকে হ্যামলেট পড়েও আমার একই অবস্থা। খুব কান্না পাচ্ছে আর কষ্ট লাগছে হ্যামলেটের জন্য।

মনটাকে হালকা করা দরকার। একবার ভাবলাম বাইরে থেকে ঘুরে আসি। কি মনে করে আবার সিদ্ধান্ত পাল্টালাম। সাজিদের টেবিলের পাশে এসে দেখলাম তার সেই বিখ্যাত (আমার মতে) ডায়েরি টেবিলের উপর থেকে আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। এই ডায়েরির অনেক কিছুই আমার পড়া। নতুন কিছু লেখা আছে কিনা দেখার জন্য উল্টাতে লাগলাম। মাঝামাঝিতে এসে দেখলাম নতুন কিছু লেখা। লেখাটার শিরোনাম 'একটি ডিএনএ-র জবানবন্দী'।

মজার বিষয় মনে হচ্ছে। ডিএনএ-র জবানবন্দী আবার কী জিনিস? পড়া শুরু করলাম। সে ঠিক যেভাবে লিখেছে আমি সেভাবেই তুলে ধরছি–

'একটি ডিএনএর জবানবন্দী'

আমি একটি DNA। আমার পূর্ণরূপ Deoxyribo Nucleic Acid। আমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে আপনারা আগে জেনে নিন DNA আসলে কী?

DNA হচ্ছে বংশপরম্পরায় বৈশিষ্ট্য নির্ধারক 'জিন'-এর ধারক ও বাহক। আপনারা কেউ আপনাদের বাবার মতো, কেউ মায়ের মতো, আবার কেউ দাদাদাদি বা নানানানীর মতো হয়ে থাকেন। DNA আপনাদের পূর্ব পুরুষদের বৈশিষ্ট্য আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছে এবং একইভাবে আপনাদের বৈশিষ্ট্য আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিয়ে যাবে।

আপনারা প্রায়ই বলেন–'তোমার সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক।'

এই কথাটা আসলে ভুল। রক্তের সম্পর্ক বলে আসলে কিছু নেই। আপনাদের আসলে বলা উচিত–'তোমার সাথে আমার DNA-র সম্পর্ক।'

আপনার চোখ দেখতে আপনার বাবার মতো। নাক আপনার মায়ের মতো। মুখ একদম আপনার দাদার মতো। চুল আপনার ভাইয়ের মতো কোঁকড়ানো। এই যে আপনি আপনার আত্মীয়স্বজনের মতো দেখতে হলেন, তাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পেলেন, এটা কীসের জন্য? এটার কারণ হলো DNA.

সংক্ষেপে এটাই DNA তথা আমাদের পরিচিতি।

আমাদের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত লেখা যায়। তবে, আমরা সেদিকে না গিয়ে এখন অন্যদিকে লাফ দেব। আচ্ছা, আপনারা 'ইনফরমেশন' তথা 'তথ্য' সম্পর্কে তো জানেন, তাই না?

ইনফরমেশন হচ্ছে এমন কিছু যা আপনাদের কোনো ব্যাপারে ইনফর্ম করে। সিম্পলি, যার মধ্যে জ্ঞান থাকে, নির্দেশ-নির্দেশনা থাকে তাই হলো ইনফরমেশন তথা তথ্য।

আরেকটু এগিয়ে যাই। ধরুন, আপনি কোনো একটি সাগর পাড়ে হাঁটছেন। ধরে নিই যে, সাগর পাড়ের এই এলাকাটিতে আপনি ছাড়া অন্য কারও প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আপনি গার্ড রেখে এই জায়গাটিতে অন্য কোনো মানুষ, পশুপাখির প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছেন। এমনকি, বিচের এই জায়গাটায় যাতে কোনো জাহাজও নোঙর করতে না পারে, তাও নিশ্চিত করেছেন।

ধরুন, হাঁটতে হাঁটতে আপনি বিচের একটি নির্জন এলাকায় এসে দেখলেন যে, বিচের বালুতে লেখা 'I Love You।'

আচ্ছা, বিচের বালুতে 'I Love You' র মতো অর্থপূর্ণ, সাজানো-গোছানো, ভাব প্রকাশক একটি বাক্য দেখার পরে আপনার তৎক্ষণাৎ কী মনে হবে? আপনি ১০০% শিওর যে, এটি আপনি কোনোভাবেই লিখেননি। নিশ্চয় মনে হবে যে, কোনো মানুষ, যার অক্ষরজ্ঞান আছে, যে 'I Love You'-এর অর্থ বোঝে, তা লিখতে সক্ষম, স্পেলিং করতে সক্ষম এমন কেউ এটি লিখে গেছে। যে এটি লিখে গেছে তার বুদ্ধি আছে। সে একটি বুদ্ধিমান সত্তা।

ধরুন, এটি দেখে আপনি খুব রেগে গেলেন। বুঝতে পারলেন যে, আপনার গার্ডদের অসচেতনতায় কেউ একজন এখানে এসেছে এবং এটি লিখে চলে গেছে। আপনি আপনার গার্ডকে ডাকলেন। বললেন–'কোন, আমি বলেছিলাম না, এখানে আমি ছাড়া অন্য কেউ যেন কোনোভাবেই ঢুকতে না পারে? আমার অবর্তমানে এখানে কে ঢুকেছে বলো?'

গার্ড কাচুমাচু করতে করতে বলল–'সাহেব, সত্যি বলছি এখানে কেউই ঢুকেনি। আল্লাহ্র কসম।'

গার্ডের কথা শুনে আপনি আরও বেশি রেগে উঠলেন। বললেন–'হোয়াট দ্যা হেল ইট ইজ? এখানে যদি কেউ না-ই ঢুকে তাহলে এই 'I Love You' লেখাটি কীভাবে এল? তুমি কি বলতে চাচ্ছো সমুদ্রের বালু, পানি আর বাতাস একসাথে মিশে এই 'I Love You' বাক্যটা নিজে নিজে তৈরি হয়ে গেছে? তুমি আমাকে এটি বিশ্বাস করতে বলছ?'

এই 'I Love You' লেখা বাক্যটা নিজে নিজে তৈরি হয়ে যেতে পারে, এটি কি আপনি কোনোমতেই বিশ্বাস করবেন? নিশ্চয় না।

ধরুন, গার্ডকে বকাঝকা করে আপনি আবার হাঁটা ধরলেন। হাঁটতে হাঁটতে আরও কিছুদূর গেলেন।

হঠাৎ আপনি দেখলেন যে, বিচের বালুর উপরে একটি বই রাখা আছে। অদ্ভুত ব্যাপার। আপনি বইটি হাতে নিলেন। খুলে দেখলেন যে, এটি একটি উপন্যাসের বই। আপনি আবার গার্ডকে ডাক দিলেন। জানতে চাইলেন এই বই এখানে কীভাবে এল? কে রেখে গেল?'

সে আবার মুখ নিচু করে বলল–'সত্যি বলছি সাহেব, এখানে কেউ আসেনি।'

আপনি চিৎকার করে আবার বলে উঠলেন, 'তাহলে এই বইটাও কি সমুদ্রের বালু, পানি আর হাওয়ার মিশ্রণে নিজে নিজে লেখা হয়ে গেছে? প্রিন্ট হয়ে গেছে? বাঁধাই হয়ে গেছে?'

একটি উপন্যাসের বই, যাতে কিছু বর্ণমালা পাশাপাশি বসে শব্দ হয়েছে, কিছু শব্দ পাশাপাশি বসে অক্ষর হয়েছে, কিছু অক্ষর পাশাপাশি বসে বাক্য হয়েছে আর অনেকগুলো অর্থপূর্ণ বাক্য নিয়ে হয়েছে একটি পুরো উপন্যাসের বই।

আচ্ছা, সমুদ্রের পানি, বাতাস আর বালুর মিশ্রণে এই বইটি নিজে নিজে লেখা হয়ে গেছে–এমনটি কেউ দাবি করলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন? করবেন না।

আপনি পাল্টা তাকে বলবেন, যেন সে পাবনা মেন্টাল হসপিটালে সিট বুক করে রাখে নিজের জন্য। ব্যাপারটা এতটাই হাস্যকর!

এমনকি, স্বয়ং মহামতি আইনস্টাইন এসে যদি পদার্থবিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বলে, এই বইটি অটোমেটিক লেখা হয়ে গেছে কোনো লেখক ছাড়াই, তখন আপনি আইনস্টাইনকেও বলবেন, 'স্যার, দয়া করে নিজের রাস্তা মাপুন। কোনো তথ্য, কোনো ইনফরমেশন, কোনো অক্ষর, কোনো বর্ণমালা, কোনো অর্থপূর্ণ রচনা লিখতে যে একটি বুদ্ধিমান সত্ত্বার দরকার অনিবার্য, তা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে।'

ধরুন, আপনি আরও কিছুদূর হেঁটে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, অপরূপ সুন্দর, ঠিক তাজমহলের মতো ডিজাইন করে মার্বেল পাথর দিয়ে একটি বিল্ডিং তৈরি করা আছে। আপনি খুব অবাক হলেন। এত সুন্দর মহলটি এখানে কীভাবে এল?

এটি দেখার সাথে সাথে আপনার কী মনে হবে?

সমুদ্রে টর্নেডোর মতো ভয়ঙ্কর ঝড় উঠত, আর সেই ঝড়ের সাথে সাথে সমুদ্রের গভীর থেকে মণি-মুক্তোওয়ালা পাথর উড়ে এসে বালু আর পানি দিয়ে এই অপূর্ব মহলটি তৈরি হয়ে গেছে?

একদম না। এটি ঘূর্ণাক্ষরেও আপনার মনে আসবে না।

আপনার যা মনে আসবে তা হলো, প্রথমে একজন ডিজাইনার তথা ইঞ্জিনিয়ারের কথা, যে এই সুন্দর মহলটির নকশা করেছে। এরপরে অন্যসব।

এই সুন্দর মহলটি তৈরির জন্য কিছু ইনফরমেশান দরকার। মহলের সামনের দরজা কোনদিকে হবে, কোন পাশে ঝরনা থাকবে, কোন পাশে বাগান। কোনদিকে গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা, কোনদিকে উদ্যান–এসবের জন্য কিছু দরকারি তথ্য তথা ইনস্ট্রাকশন দরকার। এই ইনস্ট্রাকশন একজন ইঞ্জিনিয়ার তার নকশায় বিস্তারিত এঁকে রাখে এবং এটার উপর ভিত্তি করেই একটি মহল তৈরি হয়।

ধরুন, আপনি সেই মহলে প্রবেশ করলেন। যেই মাত্র আপনি মহলে প্রবেশ করলেন, দেখলেন আপনার সামনে একটি কাগজ রাখা। কাগজটি আপনি হাতে নিলেন। খুললেন। তাতে লেখা–'এই মহলের ডান দিকটা আপনার জন্য অনিরাপদ। আপনি ভুলেও ডান দিকটায় যাবেন না। তবে, বাম দিকটা আপনার জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

আচ্ছা, কাগজের এই লেখাটা পাওয়ার পরে আপনি কি এমন কারও অস্তিত্ব অনুভব করবেন না, যে বুদ্ধিমান? যে লিখতে জানে, পড়তে জানে? যে চায় না আপনি বিপদে পড়ুন। নাকি আপনি ভাববেন যে, এই কাগজ, এই লেখা সবকিছুই আপনা-আপনি হয়েছে? অবশ্যই সেটা ভাববেন না।

এবার ধরুন, আপনি মহলটি ঘুরেফিরে দেখা অবস্থায় খেয়াল করলেন যে বাইরে, সমুদ্র পাড়ে ভীষণ ঝড় উঠেছে। খুব প্রলয়ঙ্করী ঝড়। ঝড়টা বেশ কয়েক ঘণ্টা ছিল।

ধরুন, ঝড় থামল আর আপনি মহল থেকে বের হয়ে নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরলেন। একটু এগোতেই দেখলেন একটি বালুর স্তুপ, তার উপর কিছু ছেঁড়া পলিথিন, ছেঁড়া ব্যাগ, কিছু নুড়ি পাথর এদিক-সেদিক ছড়ানো-ছিটানো। এই স্তুপ আসার পথে আপনি দেখেননি। যাবার পথেই দেখছেন।

আচ্ছা বলুন তো, এই বিদঘুটে বালুর স্তুপটা দেখে আপনার কি প্রথমেই কোনো ইঞ্জিনিয়ারের কথা মনে আসবে? মনে হবে কি এই স্তুপটা তৈরিতে একজন ইঞ্জিনিয়ারের একটি নকশা আঁকতে হয়েছে? হা হা হা। কখনোই না। আপনি নিশ্চিত ধরে নেবেন যে, এই বালুর স্তুপটি একটু আগের ঝড়ে তৈরি হওয়া। কারণ এর মধ্যে কোনো শিল্প নেই, সৌন্দর্য নেই। নেই কোনো কারুকার্যতা। ঝড়ঝাপ্টার ফলে এরকম কিছু এবড়োথেবড়ো বালুর স্তুপ, আবর্জনার স্তুপ তৈরি হতেই পারে, কিন্তু একটি অপরূপ মহল? অসম্ভব।

এতক্ষণ ধরে যা বললাম তা হলো 'তথ্য'। সেই 'I Love You', সেই উপন্যাসের 'বই', সেই মহলের 'নকশা', সেই কাগজের লেখা সবকিছুতে কিছু না কিছু তথ্য আছে। আর এই তথ্যের পেছনে আছে কোনো কনশাস মাইন্ড তথা বুদ্ধিমান সত্ত্বা।

কোনো জড় পদার্থ, প্রাকৃতিক কোনো দুর্ঘটনা কোনোদিনও কোনো ইনফরমেশন দিতে পারে না। কারণ ইনফরমেশন দিতে লাগে একটি 'মন'।

যেমন, সমুদ্রের পারে সবগুলো বাংলা অক্ষর রেখে আসলে হাজারকোটি বার ঝড়ঝাপ্টার পরেও সেই অক্ষরগুলো কোনো একদিন পাশাপাশি মিলে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র মতো কোনো কবিতা হয়ে যাবে এই সম্ভাবনা ০.০০%।

কারণ সোনারতরী কবিতা লিখতে একটি মন লাগবে, বুদ্ধিমান সত্তা লাগবে। ঝড়ঝাপ্টার পর হয়তো সেখানে আপনি কিছু অর্থবোধক শব্দ পেলেও পেতে পারেন। যেমন, প্রচণ্ড ঝড়ের কারণে 'ব' এর পাশে 'ল' অক্ষরটি এসে বসতে পারে। আর, বসলে সেটি হয়ে যাবে 'বল'। বল একটি অর্থপূর্ণ শব্দ। 'ম' এর পাশে 'হ' এবং তার পাশে 'ল' এসে বসলে পাওয়া যাবে 'মহল' শব্দ (যদিও তার সম্ভাবনা কয়েক হাজারে ১ বার হলেও হতে পারে)।

দেখুন, আপনি এরকম দুচারটি ছন্নছাড়া শব্দ পেলেও পেতে পারেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র মতো একটি কবিতা পাওয়া কোনোদিনও সম্ভব না। হাজার কেন, কোটি কোটি বছর সময় দেওয়া হলেও পাওয়া সম্ভব না।

এতক্ষণ বলা হলো তথ্যের ব্যাপারে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি–

এক: ইনফরমেশন তথা তথ্য পেতে দরকার একটি কনশাস মাইন্ড তথা বুদ্ধিমান সত্তা যার বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, চিন্তা করার ক্ষমতা আছে এবং দুই: কোনো জড় পদার্থ, কোনো অচেতন পদার্থ (টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র)

যার প্রাণ নেই, বুদ্ধি নেই, চিন্তা করার ক্ষমতা নেই তার কাছ থেকে কখনোই তথ্য পাওয়া সম্ভব না।

এবার আমরা আবার DNA-তে ফিরে আসি।

প্রাণীদের শরীরের একেবারে গাঠনিক যে উপাদান, তার নাম হলো কোষ। এই কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে, একদম কেন্দ্রে যা থাকে তার নামই DNA। এই DNA-তে চারটি অক্ষর দিয়ে আপনার পুরো শরীরের গঠনের একটি ব্লুপ্রিন্ট (নকশা) সেট করা আছে। এই চারটি অক্ষর হলো–A, T, G, C.

A= Adenine

T= Thymine

G = Guanine

C= Cytosine

বায়োলোজিস্টরা সংক্ষেপে এটাকে বলে 'জেনেটিক কোড'। কখনো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করেছেন? কম্পিউটারের প্রোগ্রামে যে-বাইনারি কোড ব্যবহার করা হয় সেটি কী রকম? সেখানে যে-সংখ্যা দুটি ব্যবহার করা হয় তা হলো ০ এবং ১।

কম্পিউটার প্রোগ্রামে বাইনারি সংখ্যাগুলো সাজানো থাকে এভাবে–০০০০১০০০১১০০১০১১। এই সংখ্যাগুলোকে কোড হিসেবে ব্যবহার করে যে-প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়, সেটার উপরই কম্পিউটারের পরবর্তী কাজ নির্দেশিত হয়। ঠিক একইভাবে, DNA-তেও A, T, G এবং C এই অক্ষর চারটির সমন্বয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামের মতোই একটি প্রোগ্রাম DNA-তে সেট করা আছে। এই প্রোগ্রামের নির্দেশনা অনুসারেই প্রাণীর শরীরে প্রোটিন তাদের কাজ করে। এই প্রোগ্রামে যদি লেখা থাকে আপনার চোখ দেখতে হবে আপনার মায়ের মতো, তাহলে আপনার চোখ ঠিক সেরকমই হবে। এই কাজটা করবে প্রোটিন। প্রোটিন এই নির্দেশটা পাবে RNA থেকে। RNA-তে এই নির্দেশ ডেলিভারি করবে DNA।

আপনার বাবা আপনাকে কোলে নিয়ে কপালে চুমু খেতে খেতে আপনার মাকে বলবেন, 'দেখো, বাবুর চোখ দুটো দেখতে ঠিক তোমার মতো?' এটা কেন হলো? কারণ DNA।

বিংশ শতাব্দীর নাস্তিকতা যার কাঁধের উপর ভর করে এগিয়েছিল, তাঁর নাম Antony Flew। উনাকে বলা হতো নাস্তিকদের 'ভাবগুরু।' নাস্তিকতার পক্ষে উনি প্রচুর সংখ্যক বই লিখেছেন, লেকচার দিয়েছেন, তর্ক করেছেন। কিন্তু ২০০৪ সালে এই বিখ্যাত নাস্তিক একদম ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দিয়ে আস্তিক হয়ে গেলেন। আস্তিক হওয়ার যে কয়েকটি মেজর কারণ/প্রমাণ তিনি উল্লেখ

করেছেন তার মধ্যে একটি হলো DNA-এর মধ্যে এই অপূর্ব 'তথ্য' তথা 'ইনফরমেশন'। তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'কোনো ফিজিক্সের ল, কোনো ন্যাচারাল কজ যেখানে একটি সিঙ্গেল কোড তৈরিতেও অক্ষম সেখানে প্রাণের স্পন্দন DNA-এর মধ্যে এই ইনফরনেশন তথা এরকম সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা কীভাবে এল যার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে প্রাণীর শরীর? নিশ্চয় এতে কোনো সুপার ন্যাচারাল ইন্টেলিজেন্সের হাত আছে।'

তিনি লিখেছেন, 'Almost entirely because of the DNA investigations. What I think the DNA material has done is that it has shown, by the almost unbelievable complexity of the arrangements which are needed to produce (life), that intelligence must have been involved in getting these extraordinarily diverse elements to work together'।

এই DNA-এর মধ্যে কী পরিমাণ তথ্য তথা ইনফরমেশন মজুদ আছে বা রাখা যাবে জানেন?

বিখ্যাত এথেইস্ট বায়োলজিস্ট, রিচার্ড ডকিন্স লিখেছেন–'There is enough information capacity in a single human cell to store the Encyclopaedia Britannica, all 30 volumes of it, three or four times over'.

একটা মাত্র কোষের মধ্যে (কোষের মধ্যে থাকে DNA) সে-পরিমাণ তথ্য রাখা যাবে যা দিয়ে ৪-৫টি ৩০ ভলিউমের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লেখা যাবে। চিন্তা করতে পারেন? শুধুমাত্র একটা কোষের মধ্যে যে-পরিমাণ তথ্য আছে তা যদি কোনো মানুষ পড়া শুরু করে, প্রতি ১ সেকেন্ডে যদি ৩ টি শব্দ সে পড়তে পারে, তাহলে একটি কোষের তথ্য পড়ে শেষ করতে একজন মানুষের সময় লাগবে ৩১ বছর।

বিজ্ঞানী Dr. Francis Collins, যিনি Human Genome Project-এর হেড ডিরেক্টর, তিনি DNA সম্পর্কে বলেছেন–'Think of DNA as an instructional script, a software program, sitting in the nucleus of the cell.'

DNA কী পরিমাণ তথা তথা ইনফরমেশন ধারণ করে উপরে তার কিছুটা নমুনা দেখানো হলো মাত্র।

এই ইনফরমেশন DNA-এর মধ্যে কীভাবে এল? কোথা হতে এল? এর কোনো সদুত্তর নাস্তিক জীব বিজ্ঞানীরা দিতে পারেননি। তারা যা বলে তা হচ্ছে এরকম–'ধরুন, আপনার কিচেনে একটি হিটার আছে। হিটারের পাশে একটি পটে চিনি, একটি পটে চা পাতা, একটি পটে দুধ এবং একটি মগে কিছু পানি রাখা আছে। এখন হলো কি.

আপনার হিটারটি নিজে নিজে অন হয়ে গেল, মগ থেকে পানি নিজে নিজে গিয়ে হিটারের উপর রাখা পাত্রে এসে পড়ল, পানি গরম হলো। এরপর পটগুলো থেকে পরিমিত পরিমাণ চিনি, চা পাতা, দুধ নিজে নিজে গিয়ে পাত্রের গরম হওয়া জলে মিশে গেল এবং তৈরি হয়ে গেল এককাপ সুস্বাদু চা। এই চা আবার নিজে নিজেই একটি কাপে গিয়ে সুন্দর করে পরিবেশন হলো। আপনি এসে দেখলেন যে, আপনার পড়ার টেবিলে এককাপ গরম গরম চা। প্রশ্ন–'এই চা কীভাবে এল?'

তাদের উত্তর–'সাইন্সের ব্লাইন্ড ল অনুসারে।'

হাস্যকর!

সাইন্সের ব্লাইন্ড ল মেনে এককাপ চা তৈরি হলেও হতে পারে (!), কিন্তু ইনফরমেশন তথা তথ্য আসার জন্য যে-একটি কনশাস মাইন্ড দরকার, তা আমরা ইতোপূর্বে পরিষ্কার করেছি। এমনকি, বিজ্ঞান মহলে সুপরিচিত 'ইনফরমেশন থিওরি'ও বলে, কোনো এনার্জি বা ম্যাটার থেকে কোনো ইনফরমেশন পাওয়া যায় না। তাহলে DNA-এর মধ্যে এরকম সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত, সুসজ্জিত তথ্য কোথা থেকে এল? আমরা এর জন্য ৪ টি ধারণার অবতারণা করতে পারি।

এক: হয়তো, কোনো মানুষ এই তথ্যগুলো DNA-তে লিখে দিয়েছে।

দুই: হয়তো কোনো এলিয়েন এই তথ্যগুলো DNA-তে লিখে দিয়েছে।

তিন: হয়তো সাইন্সের সূত্রগুলো নিজে নিজে কার্যকরী হয়ে এটা লিখে ফেলেছে।

চার: হয়তো কোনো অতি প্রাকৃতিক বুদ্ধিমান সত্তা এই তথ্যগুলো DNA-তে লিখে রেখেছে।

এখন, সমীকরণ ১ অনুসারে যদি ধরে নিই যে, কোনো মানুষ এটি লিখে রেখেছে, তাহলে প্রশ্ন আসে, এই মানুষের শরীরে যে-DNA আছে, তাতে কে তথ্যগুলো লিখল তাহলে?

দেখা যাচ্ছে সমীকরণ ১ বাতিল।

সমীকরণ ২ অনুসারে যদি ধরে নিই যে, কোনো এলিয়েন এটি লিখেছে, তাহলেও একই প্রশ্ন: এই এলিয়েনের যে-বুদ্ধি তা কোন বুদ্ধিমান সত্তা দান করেছে?

তাহলে এটাও বাতিল।

ইনফরমেশন থিওরি মতে সমীকরণ: ৩ নিজে নিজেই বাতিল হয়ে যায়। কারণ কোনো আনকনশাস মাইন্ড, কোনো বস্তু কখনোই কোনো তথ্য তথা ইনফরমেশন প্রোডিউস করতে সক্ষম নয়। পৃথিবীতে এমন একটি প্রমাণও নেই, যেখানে দেখা গেছে সাইন্সের সূত্রগুলো নিজে নিজে কার্যকর হয়ে শেক্সপিয়ারের মতো একটি সনেট লিখে ফেলেছে। তাহলে এটাও বাতিল।

বাকি থাকল সমীকরণ ৪। এই তথ্য DNA-তে কোথা হতে এল?

প্রোপার এবং লজিক্যাল উত্তর হলো: অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তা থেকে।

ঠিক, যেমনটা এককালের নাস্তিকদের গুরু Dr. Antony Flew বলেছেন: 'Almost entirely because of the DNA investigations. What I think the DNA material has done is that it has shown, by the almost unbelievable complexity of the arrangements which are needed to produce (life), that intelligence must have been involved in getting these extraordinarily diverse elements to work together'

যেমনটা ক্যামব্রিজ ফেরত গবেষক, বায়োলোজিস্ট Dr. Stephen C Meyer বলেছেন: 'The kind of information that DNA contains, namely, functionally specified information. And it requires a designer.'

তাহলে DNA-তে এই তথ্য কোথা হতে এল এর একটিই গ্রহণযোগ্য উত্তর: স্রষ্টা থেকে।'

সাজিদের ডায়েরিতে এটুকুই লেখা। আমি ডায়েরিটা বন্ধ করলাম। ভাবলাম, আমি নিজেও একজন জেনেটিক্সের ছাত্র। এই DNA নিয়ে আমি কত পড়েছি, কত জেনেছি কিন্তু এভাবেও যে ভাবা যায়, তা আমি কোনোদিন ভাবিনি।

হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার কাঁধে কেউ একজনের হাত। আমি পাশ ফিরলাম। দেখলাম সাজিদ দাঁড়িয়ে। সে বলল–'কী পড়ছিস?'

–'একটি DNA-র জবানবন্দী'

–'কী বুঝলি?'

আমার মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল এই আয়াত–'অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব আর তাদের নিজেদের মধ্যেও। তখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কোরআন সত্য।'

সাজিদ মুচকি হাসল। খুব রহস্যময় সেই হাসি।

রেফারেন্স:


- 'If Darwin had known about DNA', Dr. Harun Yahya
- 'There is a God : How the worlds most notorious atheists changed his mind', Antony Flew
- 'The blind watchmaker', Richard Dawkins
- 'Siganature in the Cell', Dr. Stephen C Mayer
- 'Language Of God', Dr. Francis Collins

# কোরআনে বিজ্ঞান–কাকতালীয় নাকি বাস্তবতা?

দেবাশীষ বলল–'ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজা আর আমাজন জঙ্গলের রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সভ্যতা খোঁজা একই ব্যাপার। দুটোই হাস্যকর। হা হা হা হা।'

ওর কথায় অন্যরা খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সাকিব বলল–'দেখ দেবাশীষ, অন্য ধর্মগ্রন্থগুলোর ব্যাপারে জানি না, তবে আল-কোরআনে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক ফ্যাক্ট নিয়ে বলা আছে যা বিজ্ঞান অতি সম্প্রতিই জানতে পেরেছে।'

দেবাশীষ বিদ্রূপের সুরে বলল–'হ্যাঁ। এজন্যই তো মুসলমানদের কেউই নোবেল পায় না বিজ্ঞানে। সব ঐ ইহুদি-খ্রিষ্টানরাই মেরে দেয়। এখন আবার বলিস না যেন ঐ সব ইহুদি-খ্রিষ্টানগুলা কোরআন পড়েই এসব বের করছে। হা হা হা। পারিসও ভাই তোরা। হা হা হা।'

রাকিব বলল–'নোবেল লাভ করার উদ্দেশ্যে তো কোরআন নাজিল হয়নি, কোরআন এসেছে একটি গাইডবুক হিসেবে। মানুষকে মুত্তাকি বানাতে।'

–'হুম, তো?', দেবাশীষের প্রশ্ন।

রাকিব কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। ঠিক সেসময় সাজিদ বলে উঠল–'আমি দেবাশীষের সাথে একমত। আমাদের উচিত না ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজা।'

সাজিদের কথা শুনে আমরা সবাই থ হয়ে গেলাম। কোথায় সে দেবাশীষকে যুক্তি আর প্রমাণ দিয়ে একহাত নেবে তা না, উল্টো সে দেবাশীষের পক্ষেই সাফাই গাইছে।

সাজিদ আবার বলতে লাগল–'আরও ক্লিয়ারলি, বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মগ্রন্থগুলোকে যাচাই করা ঠিক না। কারণ, ধর্মগ্রন্থগুলো ইউনিক। পাল্টানোর সুযোগ নেই। কিন্তু বিজ্ঞান প্রতিনিয়তই পাল্টায়। বিজ্ঞান এতই ছলনাময়ী যে, পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে সেরা বিজ্ঞানী, স্যার আলবার্ট আইনস্টাইনকেও তার দেওয়া মত তুলে নিয়ে ভুল স্বীকার করতে হয়েছে।'

দেবাশীষ বলল–'মানে? তুই কী বলতে চাস?'

সাজিদ মুচকি হাসল। বলল–'দোস্ত, আমি তো তোকেই ডিফেন্ড করছি। বলছি যে, ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খোঁজা আর তা দিয়ে ধর্মগ্রন্থকে বিচার করাটা বোকামি। আচ্ছা বাদ দে। দেবাশীষ, শেক্সপিয়ারের রচনা তোর কাছে কেমন লাগে রে?'

আমি একটু অবাক হলাম। এই আলোচনায় আবার শেক্সপিয়ার কোত্থেকে এসে পড়ল? যাহোক, কাহিনি কোনোদিকে মোড় নেয় দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

দেবাশীষ বলল–'ভালো লাগে। কেন?'

–'হ্যামলেট পড়েছিস?'

–'হ্যাঁ।'

–'পড়ে নিশ্চয় কান্না পেয়েছে?'

দেবাশীষ বাঁকা চোখে সাজিদের দিকে তাকাল। সাজিদ বলল–'আরে বাবা, এটা তো কোনো রোমান্টিক রচনা নয় যে, এটা পড়ে মজা পেয়েছিস কিনা জিজ্ঞেস করব। এটা একটা করুণ রসভিত্তিক রচনা। এটা পড়ে মন খারাপ হবে, কান্না পাবে এটাই স্বাভাবিক, তাই না?'

দেবাশীষ কিচ্ছু বলল না।

সাজিদ আবার বলল–'শেক্সপিয়ারের 'A Mid Summer Nights Dream' পড়েছিস? কিংবা 'Comedy Of Errors?'

–'হ্যাঁ'।

–'Comedy Of Errors' পড়ে হেসে কুটিকুটি হয়েছিস, তাই না? হা হা হা হা।'

দেবাশীষ বলল–'হ্যাঁ। মজার রচনা।'

সাজিদ বলল–'তোকে শেক্সপিয়ারের আরেকটি নাটকের নাম বলি। হয়তো পড়ে থাকবি। নাটকের নাম হচ্ছে 'Henry The Fourth'। ধারণা করা হয়, শেক্সপিয়ার এই নাটকটি লিখেছিলেন ১৫৯৭ সালের দিকে এবং সেটি প্রিন্ট হয় ১৬০৫ সালের দিকে।'

–'তো?'

–'আরে বাবা, বলতে দে। সেই নাটকের এক পর্যায়ে মৌমাছিদের নিয়ে দারুণ কিছু কথা আছে। শেক্সপিয়ার দেখিয়েছেন, পুরুষ মৌমাছিদের একজন রাজা থাকে। রাজাটা নির্ধারিত হয় পুরুষ মৌমাছিদের ভেতর থেকেই। রাজা ব্যতীত, অন্যান্য মৌমাছিরা হলো সৈনিক মৌমাছি। এই সৈনিক মৌমাছিদের কাজ হলো মৌচাক নির্মাণ, মধু সংগ্রহ থেকে শুরু করে সব। রাজার নির্দেশমতো, সৈনিক মৌমাছিরা তাদের প্রাত্যহিক কাজ শেষ করে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাজা মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করে। অনেকটা প্রাচীন যুগের রাজা বাদশাহদের শাসনের মতো আর কি।'

আমরা সবাই শেক্সপিয়ারের গল্প শুনছি। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

সাজিদ আবার শুরু করল–

'চিন্তা কর, শেক্সপিয়ারের আমলেও মানুষজনের বিশ্বাস ছিল যে, মৌমাছি দুই প্রকার। স্ত্রী মৌমাছি আর পুরুষ মৌমাছি। স্ত্রী মৌমাছি খালি সন্তান উৎপাদন করে, আর বাদবাকি কাজকর্ম করে পুরুষ মৌমাছিরা।'

সাকিব বলল–'তেমনটা তো আমরাও বিশ্বাস করি। এবং এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?'

–'হা হা হা। এরকমটাই হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু মৌমাছির জীবনচক্র অন্যান্য কীটপতঙ্গের তুলনায় একদম আলাদা।'

–'কী রকম?', রাকিবের প্রশ্ন।

সাজিদ বলল–'১৯৭৩ সালে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী Karl Von Frisch Physiology of Medicine বিষয়ে সফল গবেষণার জন্য চিকিৎবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল 'মৌমাছির জীবনচক্র'। অর্থাৎ মৌমাছিরা কীভাবে তাদের জীবননির্বাহ করে। এই গবেষণা চালাতে গিয়ে তিনি এমন সব আশ্চর্যজনক জিনিস সামনে নিয়ে এলেন, যা শেক্সপিয়ারের সময়কার পুরো বিশ্বাসকে পাল্টে দিল। তিনি ফটোগ্রাফি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে করে দেখিয়েছেন যে, মৌমাছি দুই প্রকার নয়, মৌমাছি আসলে তিন প্রকার।

'প্রথমটা হলো, পুরুষ মৌমাছি। দ্বিতীয় হলো স্ত্রী মৌমাছি। এই মৌমাছিদের বলা হয় Queen Bee, এরা শুধু সন্তান উৎপাদন করা ছাড়া আর কোনো কাজ করে না। এই দুই প্রকার ছাড়াও আরও এক প্রকার মৌমাছি আছে। লিঙ্গভেদে এরাও স্ত্রী মৌমাছি, তবে একটু ভিন্ন।'

–'কী রকম?', দেবাশীষ প্রশ্ন করল।

'আমরা জানি, পুরুষ মৌমাছিরাই মৌচাক নির্মাণ থেকে শুরু করে মধু সংগ্রহ–সব করে থাকে, কিন্তু এই ধারণা ভুল। পুরুষ মৌমাছি শুধু একটিই কাজ করে, আর তা হলো কেবল রানী মৌমাছিদের প্রজনন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা। মানে, সন্তান উৎপাদনে সহায়তা করা। এই কাজ ছাড়া পুরুষ মৌমাছির আর কোনো কাজ নেই।'

–'তাহলে মৌচাক নির্মাণ থেকে শুরু করে বাকি কাজ কারা করে?', রাকিব জিজ্ঞেস করল।

–'হ্যাঁ। তৃতীয় প্রকারের মৌমাছিরাই বাদ বাকি সব কাজ করে থাকে। লিঙ্গভেদে এরাও স্ত্রী মৌমাছি, কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে এরা সন্তান জন্মদানে অক্ষম। সোজা কথায়, এদের বন্ধ্যা বলা যায়।'

আমি বললাম–'ও আচ্ছা।'

সাজিদ আবার বলতে লাগল–'বিজ্ঞানী Karl Von Frisch এই বিশেষ শ্রেণির স্ত্রী মৌমাছিদের নাম দিয়েছেন Worker Bee বা কর্মী মৌমাছি। এরা Queen

Bee তথা রানী মৌমাছির থেকে আলাদা একটি দিকেই। সেটা হলো রানী মৌমাছির কাজ সন্তান উৎপাদন, আর কর্মী মৌমাছির কাজ সন্তান জন্ম দেওয়া ছাড়া অন্যসব।'

সাকিব বলল–'বাহ, দারুণ তো। এরা কি প্রাকৃতিকভাবেই সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়ে থাকে?'

–'হ্যাঁ।'

–'আরও, মজার ব্যাপার আছে। বিজ্ঞানী Karl Von Frisch আরও প্রমাণ করেছেন যে, এইসব কর্মী মৌমাছিরা যখন ফুল থেকে রস সংগ্রহে বের হয়, তখন তারা খুব অদ্ভুত একটি কাজ করে। সেটা হলো, ধর, কোনো কর্মী মৌমাছি কোনো এক জায়গায় ফুলের উদ্যানের সন্ধান পেল যেখান থেকে রস সংগ্রহ করা যাবে। তখন ঐ মৌমাছি তার অন্যান্য সঙ্গীদের এই ফুলের উদ্যান সম্পর্কে খবর দেয়। মৌমাছিটি ঠিক সেভাবেই বলে, যেভাবে যে-পথ দিয়ে সে ঐ উদ্যানে গিয়েছিল। মানে, এক্সাক্ট যে পথে সে এই উদ্যানের সন্ধান পায়, সে পথের কথাই অন্যদের বলে। আর, অন্যান্য মৌমাছিরাও ঠিক তার বাতলে দেওয়া পথ অনুসরণ করেই সে উদ্যানে পৌঁছে। একটুও হেরফের করে না। বিজ্ঞানী Karl Von Frisch এই ভারি অদ্ভুত জিনিসটার নাম রেখেছে 'Waggle Dance'।

আমি বললাম–'ভেরি ইন্টাস্টিং।'

সাজিদ বলল–'মোদ্দাকথা, Karl Von Frisch প্রমাণ করেছেন যে, স্ত্রী মৌমাছি দুই প্রকারের। রানী মৌমাছি আর কর্মী মৌমাছি। দুই প্রকারের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা। আর, পুরুষ মৌমাছি মৌচাক নির্মাণ; মধু সংগ্রহ এসব করে না। এসব করে কর্মী স্ত্রী মৌমাছিরাই।'

এই পুরো জিনিসটার উপর Karl Von Frisch একটি বইও লিখেছেন। বইটির নাম–'The Dancing Bees'। এই জিনিসগুলা প্রমাণ করে তিনি ১৯৭৩ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।

এতটুকু বলে সাজিদ থামল। দেবাশীষ বলল–'এতকিছু বলার উদ্দেশ্য কী?'

সাজিদ তার দিকে তাকাল। এরপর বলল–'যে-জিনিস ১৯৭৩ সালে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, সেই জিনিস ১৪০০ বছর আগে কোরআন বলে রেখেছে।'

দেবাশীষ সাজিদের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। সাজিদ বলল–'কোরআন যেহেতু আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে, তাই আমাদের আরবি ব্যাকরণ অনুসারে তার অর্থ বুঝতে হবে। বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনোটাতেই পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য আলাদা আলাদা ক্রিয়া (Verb) ব্যবহৃত হয় না।

'যেমন ইংলিশে পুংলিঙ্গের জন্য আমরা বলি, He does the work, আবার স্ত্রী লিঙ্গের জন্যও বলি, She does the work.

খেয়াল কর, দুটো বাক্যে জেন্ডার পাল্টে গেলেও ক্রিয়া পাল্টায়নি। পুংলিঙ্গের জন্য যেমন Does, স্ত্রীলিঙ্গের জন্যও Does. কিন্তু আরবিতে সেরকম নয়। আরবিতে জেন্ডারভেদে ক্রিয়ার রূপ পাল্টে যায়।'

আমরা মনোযোগী শ্রোতার মতো শুনছি।

সে বলে যাচ্ছে–

'কোরআনে মৌমাছির নামেই একটি সূরা আছে। নাম সূরা আন-নাহ্ল্। এই সূরার ৬৮ নাম্বার আয়াতে আছে–'(হে মুহাম্মদ) আপনার রব মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছেন যে, মৌচাক বানিয়ে নাও পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ যে-গৃহ নির্মাণ করে, তাতে।'

'খেয়াল কর, এখানে সন্তান জন্মদানের কথা বলা হচ্ছে না কিন্তু মৌচাক নির্মাণের কথা বলা হচ্ছে।

'Karl Von Frisch আমাদের জানিয়েছেন, মৌচাক নির্মাণের কাজ করে থাকে স্ত্রী কর্মী মৌমাছি। এখন আমাদের দেখতে হবে কোরআন কোন মৌমাছিকে এই নির্দেশ দিচ্ছে। স্ত্রী মৌমাছিকে, নাকি পুরুষ মৌমাছিকে? যদি পুরুষ মৌমাছিকে এই নির্দেশ দেয়, তাহলে ধরে নিতে হবে, আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে কোরআন ভুল। আরবি ব্যাকরণে, পুরুষ মৌমাছিকে মৌচাক নির্মাণ কাজের নির্দেশ দিতে যে-ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তা হলো 'ইত্তাখিজ' আর স্ত্রী মৌমাছির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'ইত্তাখিজি'।

'অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, কোরআন এই আয়াতে 'মৌমাছিকে নির্দেশ দিতে 'ইত্তাখিজ' ব্যবহার না করে, 'ইত্তাখিজি' ব্যবহার করেছে। মানে, নির্দেশটা কোরআন নিঃসন্দেহে স্ত্রী মৌমাছিকেই দিচ্ছে, পুরুষ মৌমাছিকে নয়।

'বল তো দেবাশীষ, এই সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ব্যাপারটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৪০০ বছর আগে কোন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন? এমনকি, শেক্সপিয়ারের সময়কালেও যেখানে এটা নিয়ে ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল?'

দেবাশীষ চুপ করে আছে। সাজিদ আবার বলতে লাগল–'শুধু এই আয়াত নয়, এর পরের আয়াতে আছে 'অত:পর, চোষণ করে নাও প্রত্যেক ফুল থেকে এবং চল স্বীয় রবের সহজ-সরল পথে'।'

'চোষণ বা পান করার ক্ষেত্রে আরবিতে পুংলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় 'কুল' শব্দ এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় 'কুলি'। কোরআন এখানে 'কুল' ব্যবহার না করে 'কুলি' ব্যবহার করেছে। 'সহজ সরল পথে' চলার নির্দেশের ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত শব্দ 'উসলুক', এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় 'উসলুকি'। মজার ব্যাপার, কোরআন 'উসলুক' ব্যবহার না করে, 'উসলুকি' ক্রিয়া ব্যবহার করেছে। মানে, নির্দেশটা পুরুষ মৌমাছির জন্য নয়, স্ত্রী মৌমাছির জন্য।

'আরও মজার ব্যাপার, এই আয়াতে কোরআন মৌমাছিকে একটি 'সহজ সরল' পথে চলার নির্দেশ দিচ্ছে। আচ্ছা, মৌমাছির কি পরকালে জবাবদিহিতার কোনো দায় আছে? পাপপূণ্যের? নেই। তাহলে তাদের কেন সহজ সরল পথে চলার নির্দেশ দেওয়া হলো?

'খেয়াল কর, বিজ্ঞানী Karl Von Frisch মৌমাছিদের ব্যাপারে যে আশ্চর্যজনক ব্যাপারটি লক্ষ করেছেন, তা হলো–তারা ঠিক যে পথে কোনো ফুলের উদ্যানের সন্ধান পায়, ঠিক একই পথের, একই রাস্তা অন্যদের বাতলে দেয়। কোনো হেরফের করে না। অন্যরাও ঠিক সে পথ অনুসরণ করে উদ্যানে পৌঁছে। এটাই তাদের জন্য সহজসরল পথ। বিজ্ঞানী Karl Von Frisch এটার নাম দিয়েছেন 'Waggle Dance'. কোরআনও কি ঠিক একই কথা বলছে না?

'দেবাশীষ, এখন তোকে যদি প্রশ্ন করি, কোরআন কি এই জিনিসগুলো বিজ্ঞানী Karl Von Frisch-এর থেকে নকল করেছে?

'তোর উত্তর হবে 'না।' কারণ তিনি এসব প্রমাণ করেছেন মাত্র সেদিন, ১৯৭৩ সালে। কোরআন নাজিল হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নিরক্ষর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলো ঠিক কোথায় পেলেন? কোরআন কেন এই নির্দেশগুলো পুরুষ মৌমাছিকে দিল না? কেন স্ত্রী মৌমাছিকে দিল? 'যদি এই কোরআন সুপার ন্যাচারাল কোনো শক্তি–যিনি এই মৌমাছির সৃষ্টিকর্তা, যিনি মৌমাছিদের এই জীবনচক্রের জন্য উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন–তাঁর নিকট থেকে না আসে, তাহলে ১৪০০ বছর আগে আরবের মরুভূমিতে বসে কে এটা বলতে পারে?

'যে-জিনিস ১৯৭৩ সালে আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী Karl Von Frisch নোবেল পেলেন, তা কোরআনে বহু শতাব্দী আগেই বলা আছে। কই, মুসলিমেরা কি দাবি করেছে Karl Von Frisch কোরআন থেকে নকল করেছে? করেনি। মুসলিমেরা কি তার নোবেল পুরস্কারে ভাগ বসাতে গেছে? না, যায়নি। কারণ এর কোনোটাই কোরআনের উদ্দেশ্য নয়।

'আমরা বিজ্ঞান দিয়ে কোরআনকে বিচার করি না, বরং, দিনশেষে বিজ্ঞানই কোরআনের সাথে এসে কাঁধে কাঁধ মেলায়।

এতটুকু বলে সাজিদ থেমে গেল। দেবাশীষ কিছুই বলছে না। সাকিব আর রাকিবের চেহারাটা তখন দেখার মতো। তারা খুবই উৎফুল্ল এবং খোশমেজাজি একটা চেহারায় দেবাশীষের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন তারা বলতে চাইছে– 'দে দে ব্যাটা। পারলে এবার কোনো উত্তর দে...'।

# স্রষ্টা কি এমন কিছু বানাতে পারবে, যেটা স্রষ্টা নিজেই তুলতে পারবে না?

ছুটির দিনে সারাদিন রুমে বসে থাকা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ থাকে না। সপ্তাহের এই দিন অন্য সবার কাছে ঈদের মতো মনে হলেও, আমার কাছে এই দিনটি খুবই বিরক্তিকর। ক্লাস, ক্যাম্পাস, আড্ডা–এসব স্তিমিত হয়ে যায়।

এই দিনটি আমি রুমে শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেও, সাজিদ এই দিনের পুরোটা সময় লাইব্রেরিতে কাটিয়ে দেয়। লাইব্রেরিতে ঘুরে ঘুরে নানান বিষয়ের উপর বই নিয়ে আসে।

আজ সকালেও সে বেরিয়েছে লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে। ফিরবে জুমার আগে। হাতে থাকবে একগাদা মোটা মোটা বই।

বাসায় আমি একা। ভাবলাম একটু ঘুমোব। কাল অনেক রাত পর্যন্ত বসে বসে অ্যাসাইনমেন্ট রেডি করেছি। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো টকটকে লাল হয়ে আছে। আমি হাই তুলতে তুলতে যেই ঘুমোতে যাবো, অমনি দরজার দিক থেকে কেউ একজনের কাশির শব্দ কানে এল।

ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাতেই দেখলাম, একজোড়া বড় চোখ চশমার ভিতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে নিলাম। পরনে শার্ট-প্যান্ট। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। লোকটার চেহারায় সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত 'ফেলুদা' চরিত্রের কিছুটা ভাব আছে। আমার চোখাচোখি হতেই ফিক করে হেসে দিল। এরপর বলল–'এটা কি সাজিদের বাসা?'

প্রশ্নটা আমার গায়ে লাগল। সাজিদ কি বাইরের সবাইকে এটাকে নিজের একার বাসা বলে বেড়ায় নাকি? এই বাসার যা ভাড়া, তা সাজিদ আর আমি সমান ভাগ করে পরিশোধ করি। তাহলে যুক্তিমতে বাসাটা তো আমারও।

লোকটা যতটা উৎসাহ নিয়ে প্রশ্নটা করেছে, তার দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আমি বললাম–'এটা সাজিদ আর আমার দুজনেরই বাসা।'

লোকটা আমার উত্তর শুনে আবারও ফিক করে হেসে দিল।

ততক্ষণে লোকটা ভেতরে চলে এসেছে। সাজিদকে খুঁজতে এরকম প্রায়ই অনেকেই আসে। সাজিদ রাজনীতি না করলেও, নানা রকম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যুক্ত।

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল–'সাজিদ মনে হয় ঘরে নেই, তাই না?'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম–'জ্বি না। বই আনতে গেছে। অপেক্ষা করুন, চলে আসবে।'

লোকটাকে সাজিদের চেয়ারটা টেনে বসতে দিলাম। তিনি বললেন: 'তোমার নাম?'

–'আরিফ।'

–'কোথায় পড়ো?'

–'ঢাবিতে।'

–'কোনো ডিপার্টমেন্টে?'

–'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।'

লোকটা খুব করে আমার প্রশংসা করল। এরপর বলল–'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তুমিই সাজিদ।'

লোকটার কথা শুনে আমার ছ নাম্বার হাইটা মুহূর্তেই মুখ থেকে গায়েব হয়ে গেল। ব্যাপার কী? এই লোক কি সাজিদকে চেনে না?

আমি বললাম–'আপনি সাজিদের পরিচিত নন?'

–'না।'

–'তাহলে?'

লোকটা একটু ইতস্তত বোধ করল মনে হচ্ছে। আমতা-আমতা করে বলল–'আসলে আমি একটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছি সাজিদের কাছে। প্রশ্নটি আমাকে করেছিল একজন নাস্তিক। আমি আসলে কারও কাছে এটার কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাইনি, তাই।'

আমি মনে মনে বললাম–'বাবা সাজিদ, তুমি তো দেখি এখন সক্রেটিস বনে গেছ। পাবলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তোমার দ্বারস্থ হয়।'

লোকটার চেহারায় একটি গম্ভীর ভাব আছে। দেখলেই মনে হয় এই লোক অনেক কিছু জানে, বোঝে। কিন্তু কি এমন প্রশ্ন, যেটার কোনো ফেয়ার উত্তর উনি পাচ্ছেন না? কৌতূহল বাড়ল।

আমি মুখে এমন একটি ভাব আনলাম, যেন আমিও সাজিদের চেয়ে কোনো অংশে কম নই। বরং তার চেয়ে যেন কয়েক কাঠি সরেস। এরপর বললাম–'আচ্ছা, কী সেই প্রশ্ন?'

লোকটা আমার অভিনয়ে বিভ্রান্ত হলো। হয়তো ভাবলো, আমি সত্যিই ভালো কোনো উত্তর দিতে পারব।

বলল–'খুবই ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন, স্রষ্টা সম্পর্কিত।'

আমার মনে মনে তখন প্রায় লেজেগোবরে অবস্থা। কিন্তু মুখে বললাম–'প্রশ্ন যে খুবই ক্রিটিক্যাল, সেটা তো বুঝেছি। নইলে ঢাকা শহরের এই জ্যাম-ট্যাম মাড়িয়ে কেউ এত কষ্ট করে এখানে আসে?'

আমার কথায় লোকটা আবারও বিভ্রান্ত হলো এবং আমাকে ভরসা করল। এরপর বলল–'আগেই বলে নিই, প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ/না' হতে হবে।'

–'আপনি আগে প্রশ্ন করুন, তারপর উত্তর কী হবে দেখা যাবে।' আমি বললাম।

–'প্রশ্নটা হচ্ছে, স্রষ্টা কি এমন কোনোকিছু বানাতে পারবে, যেটা স্রষ্টা নিজেই ওঠাতে পারবে না?'

আমি বললাম–'আরে মশাই, এ তো খুবই সহজ প্রশ্ন। হ্যাঁ বলে দিলেই তো হয়। ল্যাঠা চুকে যায়।'

লোকটা হাসল। মনে হলো, আমার সম্পর্কে উনার ধারণা পাল্টে গেছে। এই মুহূর্তে উনি আমাকে গবেট, মাথামোটা টাইপ কিছু ভাবছেন হয়তো।

আমি বললাম–'হাসলেন কেন? ভুল বলেছি?'

লোকটা কিছু না বলে আবার হাসল। এবার লোকটার হাসি দেখে আমি নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। প্রশ্নটা আবার মনে করতে লাগলাম।

স্রষ্টা কি এমন কোনোকিছু বানাতে পারবে, যেটা স্রষ্টা ওঠাতে পারবে না?

উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে ধরে নিচ্ছি যে, স্রষ্টা জিনিসটা বানাতে পারলেও সেটা তুলতে পারবে না। আরে এটা কীভাবে সম্ভব? স্রষ্টা পারে না এমন কোনো কাজ আছে নাকি আবার? আর, একটা জিনিস ওঠানো কি এমন কঠিন কাজ যে স্রষ্টা সেটা পারবে না?

আবার চিন্তা করতে লাগলাম। উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে ধরে নিচ্ছি যে স্রষ্টা জিনিসটা ওঠাতে পারলেও বানাতে পারবে না।

ও আল্লাহ্! কি বিপদ! স্রষ্টা বানাতে পারবে না? এটা কীভাবে সম্ভব? হ্যাঁ বললেও আটকে যাচ্ছি, আর না বললেও আটকে যাচ্ছি।

লোকটা আমার চেহারার অস্থিরতা ধরে ফেলেছে। মুচকি মুচকি হাসতে শুরু করল। আমি ভাবছি তো, ভাবছিই।

এর একটু পরে সাজিদ এল। সে আসার পরে লোকটার সাথে তার প্রাথমিক পরিচয় পর্ব ও আলাপ শেষ হলো। এর মাঝে লোকটা সাজিদকে বলে দিয়েছে যে, আমি প্রশ্নটার প্যাঁচে কী রকম নাকানিচুবানি খেলাম। সাজিদও আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হেসে নিল।

সাজিদ এরপর তার খাটে বসল। হাতে একটি কাগজের ঠোঙার মধ্যে বুট ভাজা। বাইরে থেকে কিনে এনেছে। সে বুটের ঠোঙাটা লোকটার দিকে ধরে বলল–'নিন, এখনো গরম আছে।'

লোকটা প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েও করল না। কেন করল না কে জানে। লোকটা এবার সাজিদকে তার প্রশ্নটি সম্পর্কে বলল। প্রশ্নটি হলো–

'স্রষ্টা কি এমন কিছু বানাতে পারবে, যেটা স্রষ্টা নিজে তুলতে পারবে না?'

এটুকু বলে লোকটা এবার প্রশ্নটিকে ভেঙে বুঝিয়ে দিল। বলল–'দেখো, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি 'হ্যাঁ' বলো, তাহলে তুমি ধরে নিচ্ছ যে, স্রষ্টা জিনিসটি বানাতে পারলেও, তুলতে পারবে না। কিন্তু আমরা জানি স্রষ্টা সর্বশক্তিমান। কিন্তু যদি স্রষ্টা জিনিসটা তুলতে না পারে, তিনি কি আর সর্বশক্তিমান থাকেন? থাকেন না।

'যদি এই প্রশ্নের উত্তরে তুমি 'না' বলো, তাহলে তুমি স্বীকার করছ যে, সেরকম কোনো জিনিস স্রষ্টা বানাতে পারবে না, যেটা তিনি তুলতে পারবেন। এখানেও স্রষ্টার 'সর্বশক্তিমান' গুণটি প্রশ্নবিদ্ধ। এই অবস্থায় তোমার উত্তর কী হবে?'

সাজিদ লোকটির প্রশ্নটি মন দিয়ে শুনল। প্রশ্ন শুনে তার মধ্যে তেমন কোনো ভাব লক্ষ করিনি। নরমাল।

সে বলল–'দেখুন সজিব ভাই, আমরা কথা বলব লজিক দিয়ে, বুঝতে পেরেছেন?।'

এর মধ্যে সাজিদ লোকটির নামও জেনে গেছে। কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধ লোকটিকে সে 'আঙ্কেল' কিংবা ঢাকা শহরের নতুন রীতি অনুযায়ী 'মামা' না ডেকে 'ভাই' কেন ডাকল বুঝলাম না।

লোকটি মাথা নাড়ল। সাজিদ বলল–'যে-মুহূর্তে আমরা যুক্তির শর্ত ভাঙব, ঠিক সেই মুহূর্তে যুক্তি আর যুক্তি থাকবে না। সেটা তখন হয়ে যাবে কুযুক্তি। ইংরেজিতে বলে 'Logical Fallacy'। সেটা তখন আত্মবিরোধের জন্ম দেবে, বুঝেছেন?'

–'হ্যাঁ।', লোকটা বলল।

–'আপনি প্রশ্ন করেছেন স্রষ্টার শক্তি নিয়ে। তার মানে, প্রাথমিকভাবে আপনি ধরে নিলেন যে, একজন স্রষ্টা আছেন, রাইট?'

–'হ্যাঁ।'

–'এখন স্রষ্টার একটি অন্যতম গুণ হলো তিনি অসীম, ঠিক না?'

–'হ্যাঁ, ঠিক।'

–'এখন আপনি বলেছেন, স্রষ্টা এমন কিছু বানাতে পারবে কিনা, যেটা স্রষ্টা তুলতে পারবে না। দেখুন, আপনি নিজেই বলেছেন, এমন কিছু, আই মিন Something, রাইট?'

–'হ্যাঁ।'

–'আপনি 'এমন কিছু' বলে আসলে জিনিসটার একটা আকৃতি, শেইপ, আকার বুঝিয়েছেন, তাই না? যখনই আমরা Something ব্যবহার করি, তখন মনে মনে সেটার একটা শেইপ চিন্তা করি, করি না?'

–'হ্যাঁ, করি।'

–'আমরা তো এমন কিছুকেই শেইপ বা আকার দিতে পারি, যেটা আসলে সসীম, ঠিক?'

–'হ্যাঁ, ঠিক।'

–'তাহলে এবার আপনার প্রশ্নে ফিরে যান। আপনি ধরে নিলেন যে, স্রষ্টা আছে। স্রষ্টা থাকলে তিনি অবশ্যই অসীম। এরপর আপনি তাকে এমন কিছু বানাতে বলছেন যেটা সসীম। যেটার নির্দিষ্ট একটা মাত্রা আছে, আকার আছে, আয়তন আছে। ঠিক না?'

–'হ্যাঁ।'

–'পরে শর্ত দিলেন, তিনি সেটা তুলতে পারবে না। দেখুন, আপনার প্রশ্নে লজিকটাই ঠিক নেই। একজন অসীম সত্তা একটি সসীম জিনিস তুলতে পারবে না, এটা তো পুরোটাই লজিকের বাইরের প্রশ্ন। খুবই হাস্যকর না? আমি যদি বলি, উসাইন বোল্ট কোনোদিনও দৌঁড়ে ৩ মিটার অতিক্রম করতে পারবে না, এটা কি হাস্যকর ধরনের যুক্তি নয়?'

সজিব নামের লোকটা এবার কিছু বললেন না। চুপ করে আছেন।

সাজিদ উঠে দাঁড়াল। এর মধ্যেই বুট ভাজা শেষ হয়ে গেছে। সে বইয়ের তাকে কিছু বই রেখে আবার এসে নিজের জায়গায় বসল। এরপর আবার বলতে শুরু করল–

'এই প্রশ্নটি করে মূলত আপনি স্রষ্টার 'সর্বশক্তিমান' গুণটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, আসলে স্রষ্টা নেই।

'আপনি 'সর্বশক্তিমান' টার্মটি দিয়ে বোঝাচ্ছেন যে, স্রষ্টা মানেই এমন এক সত্তা, যিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন, রাইট?'

লোকটি বললেন–'হ্যাঁ। স্রষ্টা মানেই তো এমন কেউ, যিনি যখন যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারেন।'

সাজিদ মুচকি হাসল। বলল–'আসলে সর্বশক্তিমান মানে এই নয় যে, তিনি যখন যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। সর্বশক্তিমান মানে হলো, তিনি নিয়মের মধ্যে থেকেই সবকিছু করেন। নিয়মের বাইরে গিয়ে তিনি কিছু করেন না। করতে পারেন না বলাটা ঠিক নয়, বলা উচিত তিনি করেন না। এর মানে এই না যে, তিনি সর্বশক্তিমান নন বা তিনি স্রষ্টা নন। এর মানে হলো: কিছু জিনিস তিনি করেন না, এটাও কিন্তু তাঁর স্রষ্টাসুলভ গুণাবলি। স্রষ্টা হচ্ছেন সকল নিয়মের নিয়ন্ত্রক। এখন তিনি নিজেই যদি নিয়মের বাইরের হন–ব্যাপারটি তখন

ডাবলস্ট্যান্ড হয়ে যায়। স্রষ্টা এরকম নন। তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি কখনো সেই বৈশিষ্ট্যগুলো অতিক্রম করেন না। সেগুলো হলো তার মোরালিটি। এগুলো আছে বলেই তিনি স্রষ্টা, না হলে তিনি স্রষ্টা থাকতেন না।'

সাজিদের কথায় এবার আমি কিছুটা অবাক হলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম–'স্রষ্টা পারে না এমন কী কাজ থাকতে পারে?'

সাজিদ আমার দিকে ফিরল। ফিরে বলল–'স্রষ্টা কি মিথ্যা কথা বলতে পারে? ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে? ঘুমাতে পারে? খেতে পারে?'

আমি বললাম–'আসলেই তো।'

সাজিদ বলল–'এগুলো স্রষ্টা পারেন না বা করেন না। কারণ এগুলা স্রষ্টার গুণের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু এগুলো করেন না বলে কি তিনি সর্বশক্তিমান নন? না। তিনি এগুলো করেন না, কারণ এগুলো তার মোরালিটির সাথে যায় না।'

এবার লোকটি প্রশ্ন করল–'কিন্তু এমন জিনিস তিনি বানাতে পারবেন না কেন, যেটা তিনি তুলতে পারবেন না?'

সাজিদ বলল–'কারণ স্রষ্টা যদি এমন জিনিস বানান, যেটা তিনি তুলতে পারবেন না, তাহলে জিনিসটাকে অবশ্যই স্রষ্টার চেয়েও বেশি শক্তিশালী হতে হবে। স্রষ্টা যে-মুহূর্তে এরকম জিনিস বানাবেন, সেই মুহূর্তেই তিনি স্রষ্টা হওয়ার অধিকার হারাবেন। তখন কিন্তু স্রষ্টার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে ওই জিনিসটি। কিন্তু এটা তো স্রষ্টার নীতিবিরুদ্ধ। তিনি এটা কীভাবে করবেন?'

লোকটা বলল–'তাহলে এমন জিনিস কি থাকা উচিত নয় যেটা স্রষ্টা বানাতে পারলেও তুলতে পারবে না?'

–'এমন জিনিস অবশ্যই থাকতে পারে, তবে যেটা থাকা উচিত নয়, তা হলো: এমন প্রশ্ন।'

–'কেন?'

এবার সাজিদ বলল–'যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, নীল রঙের স্বাদ কেমন? কী বলবেন? ৯ সংখ্যাটির ওজন কত মিলিগ্রাম, কী বলবেন?'

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেল মনে হলো। বলল–'নীল রঙের আবার স্বাদ কী? ৯ সংখ্যাটির ওজনই হবে কী করে?'

সাজিদ হাসল। বলল–'নীল রঙের স্বাদ কিংবা ৯ সংখ্যাটির ওজন আছে কি নেই তা পরের ব্যাপার। থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। তবে যেটা থাকা উচিত নয় সেটা হলো নীল রং এবং ৯ সংখ্যা নিয়ে এই ধরনের প্রশ্ন।'

সাজিদ বলল–'ফাইনালি আপনাকে একটি প্রশ্ন করি। আপনার কাছে দুটি অপশান। হয় 'হ্যাঁ' বলবেন, নয় তো 'না'। আমি আবারও বলছি, হয় হ্যাঁ বলবেন, নয় তো না।'

লোকটা বলল–'আচ্ছা।'

–'আপনি কি আপনার বউকে পেটানো বন্ধ করেছেন?'

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ মেরে ছিল। এরপর বলল–'হ্যাঁ।'

এরপর সাজিদ বলল–'তার মানে আপনি এক সময় বউ পেটাতেন?'

লোকটা চোখ বড় বড় করে বলল– 'আরে, না না।'

এবার সাজিদ বলল–'হ্যাঁ না হলে কী? না?'

লোকটা এবার 'না' বলল।

সাজিদ হাসতে লাগল। বলল–'তার মানে আপনি এখনো বউ পেটান?'

লোকটা এবার রেগে গেল। বলল–'আপনি ফাউল প্রশ্ন করছেন। আমি কোনোদিন বউ পেটাইনি। এটা আমার নীতিবিরুদ্ধ।

সাজিদ বলল–'আপনিও স্রষ্টাকে নিয়ে একটি ফাউল প্রশ্ন করেছেন। এটা স্রষ্টার নীতিবিরুদ্ধ।

'আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি যদি হ্যাঁ বলেন, তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, আপনি এক সময় বউ পেটাতেন। যদি 'না' বলেন, তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছেন–আপনি এখনো বউ পেটান। আপনি না 'হ্যাঁ' বলতে পারছেন, না পারছেন 'না' বলতে। কিন্তু আদতে আপনি বউ পেটান না। এটা আপনার নীতিবিরুদ্ধ। এমতাবস্থায় আপনাকে এরকম প্রশ্ন করাই উচিত নয়। এটা লজিক্যাল ফ্যালাসির মধ্যে পড়ে যায়। ঠিক সেরকম স্রষ্টাকে ঘিরেও এরকম প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। কারণ এই প্রশ্নটি নিজেই আত্মবিরোধে জড়িয়ে যায়।

'নীল রঙের স্বাদ কেমন, বা ৯ সংখ্যাটির ওজন কত মিলিগ্রাম–এ রকম প্রশ্ন যেমন লজিক্যাল ফ্যালাসি এবং এই ধরনের প্রশ্ন যেমন থাকা উচিত নয়, তেমনি, স্রষ্টা এমনকিছু বানাতে পারবে কিনা যেটা স্রষ্টা ওঠাতে পারবে না–এটাও একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি। কুযুক্তি। এরকম প্রশ্নও থাকা উচিত নয়।'

সেদিন লোকটি খুব শক্‌ড্ হলেন। ভেবেছিলেন হয়তো সাজিদ এই প্রশ্নটি শুনেই ডিগবাজি খাবে। কিন্তু বেচারাকে এরকম ধোলাই করবে বুঝতে পারেনি। সেদিন উনার চেহারাটা হয়েছিল দেখার মতো। বউ পেটানোর লজিকটা মনে হয় উনার খুব গায়ে লেগেছে।

# ভেল্কিবাজির সাতকাহন

আমাদের আড্ডার কথা তো আগেই বলেছি। সাপ্তাহিক আড্ডা। শিক্ষামূলক বটে। একেক সপ্তাহে একেক টপিকের উপর আলোচনা চলে।

আমি আর সাজিদ মাগরিবের নামাজ পড়ে এগোচ্ছিলাম। উদ্দেশ্য: আড্ডাস্থল। আজ আড্ডা হচ্ছে সেন্ট্রাল মসজিদের পেছনে। ওই দিকটায় একটা মাঝারি সাইজের বটগাছ আছে। বটতলাতেই আজ আসর বসার কথা।

খানিকটা দূর থেকে দেখলাম আড্ডাস্থলে বেশ কয়েকজনের উপস্থিতি। কেউ একজন যেন দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। তাকে দেখে শামসুর রাহমানের কবিতার দুটি লাইন মনে পড়ে গেল–

'স্বাধীনতা তুমি–
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শাণিত কথার ঝলসানি লাগা সতেজ ভাষণ।'

আড্ডাস্থলে পৌঁছে দেখি হুলস্থুল কাণ্ড। আলোচনা তখন আর আলোচনায় নেই, বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে। দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে যে কথা বলছিল, সে হলো রূপম। ঢাবির ফিলোসফির স্টুডেন্ট। এথেইজমে বিশ্বাসী। তার মতে, ধর্ম কিছু রূপকথার গল্প ছাড়া আর কিছু না। সে তর্ক করছিল হাসনাতের সাথে। হাসনাত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানথ্রোপোলজিতে পড়ে। রূপমের দাবি–একমাত্র নাস্তিকতাই স্বচ্ছ, সৎ আর বিজ্ঞানভিত্তিক কথা বলে। কোনো প্যাঁচগোছ নেই, কোনো দুই নাম্বারি নেই, কোনো ফ্রডগিরি নেই। যা বাস্তব, যা বিজ্ঞান সমর্থন করে–তা-ই নাস্তিকতা। মোদ্দাকথা, নাস্তিকতা মানে প্রমাণিত সত্য আর স্বচ্ছতার মশাল।

হাসনাতের দাবি–ধর্ম হলো বিশ্বাসের ব্যাপার। আর বিশ্বাসের ব্যাপার বলেই যে একে একেবারে 'রূপকথা' বলে চালিয়ে দিতে হবে, তা কেন? ধর্ম ধর্মের জায়গায় আর বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জায়গায়। ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যতা দেখাতে গিয়ে সে আলবার্ট আইনস্টাইন সহ বড় বড় কিছু বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের মন্তব্য কোট করতে লাগল।

আমি গিয়ে সাকিবের পাশে বসলাম। তার হাতে বাদাম ছিল। একটি বাদাম ছিলে মুখে দিলাম। সাজিদ বসল না। সে রূপমের পাশে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল। বলল–'এত উত্তেজনার কি আছে রে?'

–'উত্তেজনা হবে কেন?', রূপম বলল।

–'তোকে দেখেই মনে হচ্ছে অনেক রেগে আছিস। অ্যানিথিং রং?'

হাসনাত বলে উঠল–'উনি নাস্তিকতাকে ডিফেন্ড করতে এসেছেন। উনার নাস্তিকতা কত সাধু লেভেলের, তা প্রমাণ করার জন্যই ভাষণ দেওয়া শুরু করেছেন।'

সাজিদ হাসনাতকে ধমক দেওয়ার সুরে বলল–'তুই চুপ কর ব্যাটা। তোর কাছে জানতে চেয়েছি আমি?'

হাসনাতকে সাজিদের এইভাবে ঝাড়ি দিতে দেখে আমি পুরো হা করে রইলাম। হাসনাত সাজিদের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুদের একজন। আর এই রূপমের সাথে সাজিদের পরিচয় কদিনের? মনে হয় একবছর হবে। রূপমের জন্য তার এত দরদ কীসের? মাঝে মাঝে সাজিদের এসব ব্যাপার আমার এত বিদঘুটে লাগে যে, ইচ্ছে করে তার কানের নিচে দুচারটা লাগিয়ে দিই।

সাজিদের ধমক খেয়ে বেচারা হাসনাতের মনটা খারাপ হয়ে গেল। হওয়ারই তো কথা। সাজিদ আবার রূপমকে বলল–'বল কী হয়েছে?'

–'আমি বলতে চাইছি ধর্ম হলো গোঁজামিলপূর্ণ একটা জিনিস। সেই তুলনায় নাস্তিকতাই স্বচ্ছ, সত্য আর বাস্তবতাপূর্ণ। কোনো দুই নাম্বারি তাতে নেই।'

সাজিদ বলল–'তাই?'

–'হুম, Any Doubt?'

সাজিদ হাসল। হাসতে হাসতে সে এসে মিজবাহর পাশে বসল। রূপম বসল আমার পাশে। বটগাছের নিচের এই জায়গাটা গোলাকার করে বানানো হয়েছে। সাজিদ আর রূপম এখন মুখোমুখি বসা।

সাজিদ বলল–'বন্ধু, তুই যতটা স্বচ্ছ, সত্য আর সততার সার্টিফিকেট তোর বিশ্বাসকে দিচ্ছিস, সেটা এতটা স্বচ্ছ, সত্য আর সৎ মোটেও নয়।'

রূপম বলল–'মানে? কী বলতে চাস তুই? নাস্তিকরা ভুয়া ব্যাপারে বিশ্বাস করে? দুই নাম্বারি করে?'

–'হুম। করে তো বটেই। এটাকে জোর করে বিশ্বাসও করায়।'

–'মানে?'

সাজিদ নড়েচড়ে বসল। বলল–'খুলে বলছি।'

এরপরে সাজিদ বলতে শুরু করল–'বিজ্ঞানীরা যখন DNA আবিষ্কার করল, তখন দেখা গেল আমাদের শরীরের প্রায় ৯৬–৯৮% DNA হলো নন-কোডিং, অর্থাৎ, এরা প্রোটিনে কোনো প্রকার তথ্য সরবরাহ করে না। ২-৪% DNA ছাড়া বাকি সব DNA-ই নন-কোডিং। এগুলোর তখন নাম দেওয়া হলো Junk DNA। Junk শব্দের মানে তো জানিস, তাই না? Junk শব্দের অর্থ হলো আবর্জনা। অর্থাৎ, এই ৯৮% DNA-র কোনো কাজ নেই বলে এগুলোকে বাতিল DNA বা Junk DNA বলা হয়।

'ব্যস, এটা আবিষ্কারের পরে বিবর্তনবাদী নাস্তিকেরা খুশিতে লম্ফঝম্প শুরু করে দিল। তারা ফলাও করে প্রচার করতে লাগল যে, আমাদের শরীরে যে-৯৮% DNA আছে, সেগুলো হলো Junk, অর্থাৎ, এদের কোনো কাজ নেই। এই ৯৮% DNA ডারউইনের বিবর্তনবাদের পক্ষে অনেক বড় প্রমাণ। তারা বলতে লাগল–মিউটেশনের মাধ্যমে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সময় এই বিশাল সংখ্যক DNA আমাদের শরীরে রয়ে গেছে। যদি কোনো বুদ্ধিমান স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টি করত, তাহলে এই বিশাল পরিমাণ অকেজো, অপ্রয়োজনীয় DNA তিনি আমাদের শরীরে রাখতেন না। কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান সত্তার হাত ছাড়া, প্রকৃতির অন্ধ প্রক্রিয়ায় আমরা অন্য একটি প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছি বলেই এই বিশাল অপ্রয়োজনীয়, অকেজো DNA আমাদের শরীরে এখনো বিদ্যমান। বিবর্তনবাদীদের গুরু বিখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তো এই Junk DNA-কে বিবর্তনবাদের পক্ষে বড়সড় প্রমাণ দাবি করে করে একটি বিশাল সাইজের বইও লিখে ফেলেন। বইটির নাম 'The Selfish Gene'। কিন্তু বিজ্ঞান ঐ Junk DNA তে আর বসে নেই। বর্তমানে এপিজেনেটিক্সের গবেষণা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, এতদিন যে DNA কে Junk বলে বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার কোনোকিছুই Junk নয়। আমাদের শরীরে এগুলোর রয়েছে নানারকম বায়োকেমিক্যাল ফাংশন। যেগুলোকে নাস্তিক বিবর্তনবাদীরা এতদিন অকেজো, বাতিল, অপ্রয়োজনীয় বলে বিবর্তনের পক্ষে বড়সড় প্রমাণ বলে লাফিয়েছে, সাম্প্রতিক গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, এসব DNA মোটেও অপ্রয়োজনীয়, অকেজো নয়। মানবদেহে এদের রয়েছে নানান ফাংশন। নাস্তিকরা বলত, প্রকৃতির অন্ধ প্রক্রিয়ায় মানুষ অন্য একটি প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছে বলেই এরকম অকেজো, নন-ফাংশনাল DNA শরীরে রয়ে গেছে। যদি কোনো সৃষ্টিকর্তা বিশেষভাবে মানুষকে সৃষ্টি করত, তাহলে এরকম অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের শরীরে থাকত না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এসব DNA মোটেও নন-ফাংশনাল নয়। আমাদের শরীরে এদের অনেক কাজ রয়েছে। তাহলে বিবর্তনবাদীরা এখন কী বলবে? তারা তো বলেছিল 'অপ্রয়োজনীয়' বলেই এগুলো বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ। কিন্তু এগুলোর প্রয়োজন যখন জানা গেল, তখনও কি তারা একই কথা বলবে? ডকিন্স কি তার 'The Selfish Gene' বইটা সংশোধন করবে? বিবর্তনবাদীরা কি তাদের ভুল শুধরে নিয়ে ক্ষমা চাইবে? বল দোস্ত, এটা কি দুই নাম্বারি না?'

লম্বা একটা ব্রিফের পর সাজিদ থামল। রূপম বলল–'বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এরকম দুএকটি ধারণা পাল্টাতেই পারে। এর মাধ্যমে কি চিটিং করা হয়?'

সাজিদ বলল–'না। এটা চিটিং নয়। কিন্তু বিজ্ঞান কোনো ব্যাপারে ফাইনাল কিছু জানানোর আগেই তাকে কেনো নির্দিষ্ট কিছু একটার পক্ষে প্রমাণ বলে চালিয়ে দেওয়া, প্রতিপক্ষকে এটা দিয়ে একহাত নেওয়া এবং এটার পক্ষে কিতাবাদি লিখে ফেলাটা চিটিং এবং নাস্তিকরা তা-ই করে।'

সাজিদ বলল–'শুধু Junk DNA নয়। আমাদের শরীরে যে-অ্যাপেন্ডিক্স আছে, সেটা নিয়েও কত কাহিনি তারা করেছে। তারা বলেছে, অ্যাপেন্ডিক্স হলো আমাদের শরীরে অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ। আমাদের শরীরে এটার কোনো কাজ নেই। যদি কোনো বুদ্ধিমান সত্তা আমাদের সৃষ্টি করত, তাহলে অ্যাপেন্ডিক্সের মতো অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ আমাদের শরীরে রাখত না। আমরা শিম্পাঞ্জি জাতীয় একপ্রকার প্রাণী থেকে প্রকৃতির অন্ধ প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত বলেই এরকম অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ আমাদের শরীরে রয়ে গেছে। এটার কোনো কাজ নেই। এটাকে তারা বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ বলে চালিয়ে দিত। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, অ্যাপেন্ডিক্স মোটেও কোনো অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ নয়। আমাদের শরীরে যাতে রোগ জীবাণু, ভাইরাস ইত্যাদি প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য যে-টিস্যু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, সেটার নাম লিম্ফ টিস্যু। এই টিস্যু আমাদের শরীরে অনেকটা সৈনিক তথা প্রহরীর মতো কাজ করে। আর আমাদের বৃহদন্ত্রের মুখে প্রচুর লিম্ফ টিস্যু ধারণকারী যে-অঙ্গ আছে, তার নাম অ্যাপেন্ডিক্স। যে-অ্যাপেন্ডিক্সকে একসময় 'অকেজো' ভাবা হতো, বিজ্ঞান এখন তার অনেক ফাংশনের কথা আমাদের জানাচ্ছে। বিবর্তনবাদীরা কি আমাদের এ ব্যাপারে কোনোকিছু নসিহত করতে পারে? এখনো কি বলবে অ্যাপেন্ডিক্স অকেজো? বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ?'

রূপম চুপ করে আছে। সাজিদ বলল–এ তো গেল মাত্র দুটি ঘটনা। তুই কি মিসিং লিঙ্কের ব্যাপারে জানিস রূপম?'

আমার পাশ থেকে রাকিব বলে উঠল–'মিসিং লিঙ্ক আবার কী জিনিস?'

সাজিদ রাকিবের দিকে তাকাল। বলল–'বিবর্তনবাদীরা বলে থাকে একটা প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে অন্য একটা প্রাণী বিবর্তিত হয়। তারা বলে থাকে, শিম্পাঞ্জি থেকে আমরা, মানে মানুষ এসেছে বিবর্তন প্রক্রিয়ায়। যদি এরকম হয়, তাহলে শিম্পাঞ্জি থেকে কিন্তু এক লাফে মানুষ চলে আসেনি। অনেক অনেক ধাপে শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষ এসেছে। ধর, ১ সংখ্যাটা বিবর্তিত হয়ে ১০-এ যাবে। এখন ১ সংখ্যাটা কিন্তু এক লাফে ১০ হয়ে যাবে না। তাকে অনেকগুলো মধ্যবর্তী পর্যায় (২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) অতিক্রম করে ১০ হতে হবে। এই যে ১০-এ আসতে সে অনেকগুলো ধাপ (২, ৪, ৭, ৮, ৯) অতিক্রম করল, এই ধাপগুলোই হলো ১ এবং ১০-এর মিসিং লিঙ্ক।'

রাকিব বলল–'ও আচ্ছা, বুঝলাম। শিম্পাঞ্জি যখন মানুষে বিবর্তিত হবে, প্রাথমিক পর্যায়ে তার মধ্যে কিছু মানুষের কিছু শিম্পাঞ্জির বৈশিষ্ট্য আসবে। এই বৈশিষ্ট্য সংবলিত পর্যায়টাই মিসিং লিঙ্ক, তাই না?'

–'হুম। যেমন ধর, মৎস্যকন্যা। তার অর্ধেক শরীর মাছ, অর্ধেক শরীর মানুষ। তাহলে তাকে মাছ এবং মানুষের একটি মধ্যবর্তী পর্যায় হিসেবে ধরা যায়। এখন কেউ যদি দাবি করে যে, মাছ থেকে মানুষ এসেছে, তাহলে তাকে ঠিক মৎস্য কন্যার মতো কিছু একটা এনে প্রমাণ করতে হবে। এটাই হলো মিসিং লিঙ্ক।'

রূপম বলল–'তো এটা নিয়ে কি সমস্যা?'

সাজিদ আবার বলতে লাগল–'বিবর্তনবাদ তখনই সত্যি হবে যখন এরকম সত্যিকার মিসিং লিঙ্ক পাওয়া যাবে। পৃথিবীতে কোটি কোটি প্রাণী রয়েছে। সেই হিসাবে বিবর্তনবাদ সত্য হলে কোটি কোটি প্রাণীর বিলিয়ন বিলিয়ন এরকম মিসিং লিঙ্ক পাওয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু মজার ব্যাপার, এরকম কোনো মিসিং লিঙ্ক আজ অবধি পাওয়া যায়নি। গত দেড় শ বছর ধরে অনেক অনেক ফসিল পাওয়া গেছে কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই মিসিং লিঙ্ক নয়। বিবর্তনবাদীরা তর্কের সময় এই মিসিং লিঙ্কের ব্যাপারটা খুব কৌশলে এড়িয়ে যায়। কেউ কেউ বলে আরও সময় লাগবে। বিজ্ঞান একদিন ঠিকই সব পেয়ে যাবে, ইত্যাদি।

'কিন্তু, ১৯৮৩ সালে বিবর্তনবাদীরা একটা মিসিং লিঙ্ক পেয়ে গেল যা প্রমাণ করে যে মানুষ শিম্পাঞ্জী গোত্রের কাছাকাছি কোনো এক প্রাণী থেকেই বিবর্তিত। এটার নাম দেওয়া হলো Ida.

বিবর্তনবাদ দুনিয়ায় রাতারাতি তো ঈদের আমেজ নেমে এল। তারা এটাকে বলল 'The Eighth Wonder of The World'। কেউ কেউ তো বলেছিল 'আজ থেকে কেউ যদি বলে বিবর্তনবাদের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, তারা যেন Ida-কে প্রমাণ হিসেবে হাজির করে। বিবর্তনবাদীদের অনেকেই এটাকে 'Our Monalisa' বলেও আখ্যায়িত করেছিল। হিস্ট্রি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ডিসকভারি চ্যানেলে এটাকে ফলাও করে প্রচার করা হলো। সারা বিবর্তনবাদ দুনিয়ায় তখন সাজ সাজ রব। কিন্তু, বিবর্তনবাদীদের কান্নায় ভাসিয়ে ২০১০ সালের মার্চে টেক্সাস ইউনিভার্সিটি, ডিউক ইউনিভার্সিটি আর ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর গবেষক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দেখালেন যে, এই Ida কোনো মিসিং লিঙ্ক নয়। এটা Lamour নামক একটি প্রাণীর ফসিল। তাদের এই রিসার্চ পেপার যখন বিভিন্ন নামিদামি সাইন্স জার্নালে প্রকাশ হলো, রাতারাতি বিবর্তনবাদ জগতে শোক নেমে আসে। বল রূপম, এটা কি জালিয়াতি নয়? একটা আলাদা প্রাণীর ফসিলকে মিসিং লিঙ্ক বলে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া কি চিটিং নয়?'

'এর চেয়েও জঘন্য কাহিনি আছে এই বিবর্তনবাদীদের। ১৯১২ সালে 'Piltdown Man' নামে ইংল্যান্ডের সাসেক্সে একটি জীবাশ্ম পাওয়া যায় মাটি খুঁড়ে। এটিকেও রাতারাতি বানর ও মানুষের মিসিং লিঙ্ক বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। এটাকে তো ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য রেখে দেওয়া হয়। বানর ও মানুষের এই মিসিং লিঙ্ক দেখতে হাজার হাজার দর্শনার্থী আসত। কিন্তু ১৯৫৩ সালে কার্বন টেস্ট করে প্রমাণ করা হয় যে, এটি মোটেও কোনো মিসিং লিঙ্ক নয়। এটাকে কয়েক শ বিলিয়ন বছর আগের বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গবেষণায় দেখা যায়, এই খুলিটি মাত্র ৬০০ বছর আগের আর এর মাড়ির দাঁতগুলো 'ওরাং ওটাং' জাতীয় অন্য প্রাণীর। রাতারাতি বিবর্তন মহলে শোক নেমে আসে।

'বুঝতে পারছিস রূপম, বিবর্তনবাদকে জোর করে প্রমাণ করার জন্য কত রকম জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে? একটা ভুয়া জিনিসকে কীভাবে বছরের পর বছর ধরে প্রমাণ হিসেবে গেলানো হয়েছে? ইন্টারনেট ঘাঁটলে এরকম জোড়াতালি দেওয়া অনেক মিসিং লিঙ্কের খবর তুই এখনো পাবি। মোদ্দাকথা, এই নাস্তিকতা, এই বিবর্তনবাদ টিকে আছে কেবল পশ্চিমা বস্তুবাদীদের অব্যাহত মিথ্যাচার, ক্ষমতা আর টাকার জোরে। এই বিবর্তনবাদের সর্বশেষ অস্ত্র ধর্মকে বাতিল বলে বয়কট করা। এই দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, মানুষকে গেলানোর জন্য তাদের যা যা করতে হয়, তারা করবে। যত ধরনের জালিয়াতির আশ্রয় নিতে হয়, তারা নিতে পিছপা হবে না। এরপরও কি বলবি তোর নাস্তিকতা সাধু? সৎ? প্রতারণাবিহীন নির্ভেজাল জিনিস?'

রূপম কিছু না বলে চুপ করে আছে। হাসনাত বলে উঠল–'ইশ! কিরে রুপম, এতক্ষণ তো নাস্তিকতাকে নির্ভেজাল, সৎ, সাধু, কোনো দুই নাম্বারি নেই, কোনো ফ্রডবাজি নেই বলে লেকচার দিচ্ছিলি। এখন কিছু বলবি না?'

ইশার আজান হলো। আমরা নামাজে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। আমাদের সাথে রাকিব আর হাসনাতও আছে। অল্প একটু পথ হাঁটার পরে আমি হঠাৎ থেমে গেলাম। সাজিদ বলল–'তোর আবার কী হলো রে?'

আমি রাগিরাগি চেহারায়, বড় বড় চোখ করে বললাম–'তুই ব্যাটা হাসনাতকে তখন ঐভাবে ঝাড়ি দিয়েছিলি কেন?'

সাজিদ হাসনাতের দিকে তাকাল। মুচকি হেসে বলল–'শেক্সপিয়র বলেছেন –'Sometimes I have to be cruel just to be kind'।

আমরা সবাই হা হা হা করে হেসে ফেললাম।

রেফারেন্স :

**Junk DNA-এর রেফারেন্স:**


- Report of 'The Guardian'- Breakthrough study overturns theory of 'Junk DNA' in genome (5 September 2012)
- Report Of 'New York Times'- Bits of Mystery DNA, Far From Junk Play Crucial Role (5 September 2012)
- Report of 'Evolutionnews'- Junk No More: ENCODE Project Nature Paper Finds "Biochemical Functions for 80% of the Genome" (September 05, 2012)


'অ্যাপেন্ডিক্স'-এর রেফারেন্স:


- Report Of 'Science Daily'- Immune cells make appendix 'silent hero' of digestive health (November 30, 2015)
- Report Of 'Science Daily'- Appendix Isn't Useless At All: It's A Safe House For Good Bacteria ( October 08, 2007)
- Report Of 'Fox News'- Appendix May Produce Good Bacteria, Researchers Think (October 05, 2007)


মিসিং লিঙ্ক **'Ida'**-এর রেফারেন্স:


- Report Of 'Daily Mail'- Missing link? Ida was not even a close relative say fossil experts (October 22, 2009)
- Report Of 'Ideacenter'- The Rise and Fall of Missing Link Superstar "Ida"


জালিয়াতিপূর্ণ ফসিল **'Piltdown Man'**-এর রেফারেন্স:


- Report Of 'Science Mag'- Study reveals culprit behind Piltdown Man, one of science most famous hoaxes (August 09, 2016)
- Report of 'Live Science'- Piltdown Man: Infamous Fake Fossil (September 30, 2016)


❖ ❖ ❖

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

আরিফ আজাদ। জন্মেছেন চট্টগ্রামে। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট। লিখেন বিশ্বাসের কথা। বিচূর্ণ করেন অবিশ্বাসের আয়না।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭-তে তার প্রথম গ্রন্থ 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ'।

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০।
www.facebook.com/gurdianpubs

ISBN : 978-984-92959-0-7